প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী অভিনব কিশোর গ্রন্থ

দাদু-নাতির দৌড়

[হাস্য-রসাশ্রিত অভিনব কিশোর উপন্যাস]

শিবরাম চক্রবর্তী

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক

৪৪।১ সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা (১১ই জুলাই, ১৯৫৪)

নূতন প্রকাশ :

প্রকাশক :
পি, দে
৪৪।১ সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
ভবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
সুবোধ গুপ্ত

পুস্তক বাঁধাই :
সিটি বাইণ্ডার্স
৪৪।১ এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

॥ উৎসর্গ ॥

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী ভাস্বতী (টুকটুকি) বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

কল্যাণীয়

শ্রীমান অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু

দাদু-নাতির দৌড়

মাঝরাতে টুসির দাদুর পেট ব্যথাটা হঠাৎ খুব-জোর চাগাড় দিয়ে উঠলো। দু'হাতে পেট আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি এই কলিক্! এতেই প্রাণ তাঁর লিক্ করে বুঝি এক্ষুণিই। তাঁর মর্মান্তিক হাঁকডাক শুরু হয়—"টুসি! টুসি!"

টুসি ঘুমোচ্ছিল পাশের বিছানাতেই, জেগে ওঠে সে। "কি দাদু! ডাক্‌ছো আমায়?"

"এক্ষুণি যা একবার বামাপদ ডাক্তারের কাছে। ছুটে যাবি। বলবি যে, মরতে বসেছে দাদামশাই।"

"অ্যাঁ?—"টুসি ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসে।

"বলবি যে, সেই কলিক্‌টা—। হঠাৎ ভয়ানক—। উঃ!"

ওঃ! সেই কলিক্! অনেকটা আশ্বস্ত হয় টুসি। "ষ্টোভে জল গরম ক'রে বোতলে পুরে দেবো তোমায় দাদু? চেপে ধরবো তোমার পেটে?"

"ধুত্তোর বোতল! বোতলেই যদি কাজ হোতো, তাহলে লোকে আর ডাক্তার ডাকতো না! বোতলের কাছেই ব্যবস্থা নিত সবাই! উঃ! আঃ! ওরে বাবারে! গেলাম রে!"

দাদুর আর্তনাদে বিকল হয়ে পড়ে টুসি। বামাপদবাবুকে কল্ দিতেই হয়। কি আর করা? "কিন্তু এই রাত্তিরে? এত রাত্তিরে?" রাত-বিরেতে রাস্তায় বেরুতে টুসি স্বভাবতঃই একটু ইতস্ততঃ করে।

"বেশি কি রাত হয়েছে শুনি? এই তো সবে দুটো। আর এমন কি দূর? দেরি করিসনে—যা!" আর্তনাদের ফাঁকে-ফাঁকে উৎসাহ বাণী বিতরণ করে ওর দাদু।

শার্ট-গায়ে, স্লিপার-পায়ে তৈরি হয় টুসি। ছোট্টো মনিব্যাগ্‌টা পড়ে যায় পকেট থেকে; যথাস্থানে তাকে আবার তুলে রাখে। ফাউন্টেনপেনটাও আঁটে বুকে। এত রাত্তিরে কে আর দেখছে তার কলম। তাহলেও—তবুও—!

"ছুটতে ছুটতে যাবি! দাঁড়াবিনে কোথাও! যাবি আর আসবি! আমি খাবি খাচ্ছি। বুঝেছিস?"

অতঃপর মর্মন্তুদ অব্যয়শব্দ-অপপ্রয়োগের পালা শুরু হয় ওর দাদুর—"মা গো! গেলুম গো! বাবা গো! উঃ! আঃ! ইস্! উহুহু! কোথায় যাবো রে!"

ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে পড়ে টুসি। এক পলকও দাঁড়ায় না আর!

প্রথম খানিকটা সে সবেগেই যায়—কিন্তু ক্রমশঃই ওর গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসে। স্বাভাবতঃই সে একটু মোটা; তাড়াহুড়ার পক্ষে খুব যে উপযোগী নয়, অল্পক্ষণেই সে তা বুঝতে পারে। তবু তার দাদুর যে এখন-তখন, একথা ভাবতেই টুসির মন ভারী হয়ে আসে—ভারী পা-কে তাড়িত করে দেয়। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে ছোটে।

এমন সময় রাস্তার এক প্রাণী অযাচিতভাবে এসে টুসির গতিবৃদ্ধির সহায়তায় লাগে; যদিও সে সাহায্য না করলেও—টুসির নিজের মতে—বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না।

জনবিরল পথ। কোনো লোক নেই কোথাও। একটা মোটরও চলে না রাস্তায়। কেবল ইঁদুররাই এই সুযোগে মহাসমারোহে রাস্তা পারাপার করছে—এধারের ফুটপাথ পেরিয়ে ওদিকের অন্দরে গিয়ে সেঁধুচ্ছে। ওদিক্ থেকে ছুটে আস্‌ছে এদিকে।

যথাসম্ভব তেজে চলেছে টুসি, ইঁদুরদের শোভাযাত্রায় পদাঘাত না করে—সবদিক্ বাঁচিয়ে।

এমন সময় একটা কুকুর—

ইঁদুরদের পেছনেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল সে বোধহয়, কিন্তু বৃহত্তর শিকার পেয়ে ক্ষীণজীবীদের পরিত্যাগ করতে মুহূর্তের জন্যও সে দ্বিধা করলো না। টুসির পেছনে এসে লাগলো সে।

"ঘেউ ঘেউ-ঘেউউউ!"

টুসি দৌড়োয়—আরো—আরো জোরে। আরো—আরো—আরো তীরবেগে সে ছুটতে শুরু করে।

কুকুরও সশব্দে দৌড়োয়—টুসির পেছনে-পেছনেই।

হাঁপ ফেলবার ফাঁক নেই টুসির। প্রাণপণে সে দৌড়োচ্ছে। ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই ওর। না ফিরেই সে উদ্ধত আওয়াজ শোনে, উদ্যত নখদন্ত নিজের মনশ্চক্ষেই দেখতে পায়। আরো আরো জোরে সে ছুটতে থাকে।

ছুটতে-ছুটতে তার মনে হয়, দৌড়োচ্ছে সে এমন আর মন্দ কি মোটা বলে ইস্কুলের ছেলেরা দৌড়ের-স্পোর্টসে নামাবার জন্যে প্রায়ই তাকে ওস্‌কায়; কিন্তু এরকম একটা কুকুরের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রথম পুরস্কারই মেরে দিতে পারে সে এক ছুটেই—হ্যাঁ!

কিন্তু দরকারের সময় কোথায় তখন কুকুর? এখন-যখন তেমন তাড়া নেই, কুকুরের তাড়নায় ছুটতে হচ্ছে ওকে।

ছুটবার মুখে টুসির সম্মুখে এসে পড়ে একটা পার্ক—লোহার সরু করুগেট্-শিকের রেলিং দিয়ে ঘেরা। পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁপ ছাড়ে টুসি। কুকুরটা বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। বড় আর একটা উচ্চবাক্য করে না সে—কি হবে অকারণ 'ঘেউৎকারে' গলা ফাটিয়ে? নিরাপদ-বেষ্টনীর মধ্যে শিকার এখন! শিকের রেলিং ডিঙিয়ে, কি তার কায়দার দরজা খুলে-ভেজিয়ে ভেতরে ঢোকার কৌশল তো ওর জানা নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিতান্তই জিহ্বা-আস্ফালন এবং ল্যাজ-নাড়া ছাড়া আর তার উপায় কি?

পার্কের ওধারে একটা গ্যাসের বাতি খারাপ হয়ে দপ্ দপ্ করছিল। প্রায় নিভবার মুখেই আর কি! বাতির অবস্থা

দেখে দাছুর অবস্থা ওর মনে পড়ে। তাঁর জীবন-প্রদীপও এতক্ষণে হয়তো ওই বাতির ন্যায়ই—! ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে টুসি।

পার্কের ওধারের গেটটা পেরিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলেই বামাপদবাবুর বাড়ি।

টুসি পার্কের অন্যধারে যায়। গেটটা আবার কিছুটা দূরেই—অতটা ঘুরে যেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। সামনেই রেলিংএর একটা শিক বেশ ফাঁক-করা, দেখতে পায় সে। ছেলেপিলেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যেই বিধাতার দয়ায় নিশ্চয়ই এই ফাঁকের সৃষ্টি! ফাঁকের নেপথ্য দিয়ে—ফাঁকি দিয়ে গলে যাবার সোজা রাস্তা নেয় সে।

কিন্তু টুসির হিসেবে ভুল ছিল। ঈষৎমাত্র। ছেলের মধ্যে ধরলেও পিলের মধ্যে কিছুতেই ওকে ধরা যায় না, বরং একটা পিপের সঙ্গেই তার উপমা ঠিক মেলে। কাজেই মধ্যপথেই সে আটকে যায়—ঠিক তার দেহের মধ্যপথে। এগুতেও পারে না, পেছিয়ে আসাও অসম্ভব হয়।

বহুক্ষণ রেলিংএর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে—করুগেট্-শিকের বাহুপাশ কিন্তু একচুলও শিথিল হয় না। অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে ছায় সে। কী মুস্কিলেই সে পড়লো বলো তো! কোথায় বিছানায় আরামে, না কোথায় রেলিংএর 'ব্যাড়া-মে'! কান্না পেতে থাকে তার।

কুকুরটাও এতক্ষণে গোটা পার্কটা ঘুরে-ফিরে তার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। টুসির মুখের ওপরেই সে লাফাতে ঝাঁপাতে শুরু করে এবার।

অসহায় হয়ে হাত-পা ছোঁড়ে টুসি—কি আর করবে? তাও একখানা হাত, আধখানা পা—তার বেশি আর নয়। পালিয়ে বাঁচবার উপায় তার নেই। আগেই সে পথ সে রুদ্ধ করেছে।

ওকে ছেড়ে ওর কোঁচা ধরে টানতে থাকে কুকুরটা। অ্যাঁ! মুক্তকচ্ছ করে দেবে নাকি! মতলব তো ভালো নয় ওর! দু'হাতে

প্রাণপণে কাপড় চেপে ধরে টুসি—গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে। এক কামড়ে কোঁচার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে যায় কুকুরটা। হ্যাঁ, বিরক্ত হবেই তো! ছুটোপাটি নেই, দৌড়ঝাঁপ নেই, এরকম ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রেলিংএর গায় লেগে থাকা খেলা ভালো লাগে না ওর। ইঁদুরদের খোঁজেই সে চলে যায় আবার।

কুকুরটা ওকে বর্জন করে গেলে কিছুটা স্বস্তি পায় সে। খানিক বাদে একটা লোক যায় পাশ দিয়ে—টুসি তার দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ে।

"ও মশাই! মশাই গো!"

"কে?" লোকটা চম্‌কে ওঠে। —"কী? কি হয়েছে তোমার?" টুসির কাছে এসে জিগ্যেস করে সে।

"আমাকে এখান থেকে বের করে দিন না দাদা!" টুসির কণ্ঠস্বর নিতান্তই করুণ। "ভারি মুস্কিলে পড়েছি আমি!"

ওর অবস্থা দেখে হাসতে শুরু করে ছ্যায় লোকটা। "বাঃ! বেড়ে তো! কার অঞ্চলের নিধি এখানে এসে আটকা পড়েছো চাঁদ! আছে নাকি কিছু টঁ্যাকে?"

টুসির পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ্‌টা সে হাতিয়ে নেয়। দাদুর দেওয়া ইস্কুলের মাইনে আর বায়স্কোপ-দেখার পয়সা—সবই যে রয়েছে ঐ ব্যাগে। টুসির যথাসর্বস্ব! সমস্তই বাগিয়ে নিয়ে লোকটা সত্যিই চলে যায় যে—! বাঃ! বেশ মজা তো!

টুসি চেঁচাতে শুরু করে—"পিক্-পকেট! পিক্-পকেট! পকেটমার! পুলিস! ও পুলিস! চোর, ডাকাত, খুনে! পালাচ্ছে—পালিয়ে যাচ্ছে—পুলিস! ও পুলিস!"

লোকটা ফিরে আসে ফের—"অমন করে চ্যাঁচাচ্ছো কেন যাদু? এই নিশুত রাতে শুনবে কে? কে জেগে আছে সারারাত তোমার জন্যে হারানিধি? এই যে, বঃ! ফাউণ্টেনপেনও আছে দেখছি! দেখি—বাঃ! বেশ পেনটি তো! - পার্কার? কিচ্ছু মনে কোরো না লক্ষ্মী ভাইটি!"

অতঃপর কলমটিও হস্তগত করে ওর মাথায় আদর করে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে যায় লোকটা! টুসি আর চ্যাঁচায় না এবার।

কতক্ষণ যে এভাবে কাটে, জানে না সে—হঠাৎ ভারী একটা সোরগোল শুনতে পায় টুসি।

"চোর-চোর! পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো! উধর্‌ ভাগা!"

হ্যাঁ, সেই পকেট-কাটা হতভাগাই! ছুটতে-ছুটতে এসে টুসির পাশের রেলিং টপকে পার্কের ওধারের গেট দিয়ে সে উধাও হয়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই এক পাহারাওয়ালা এসে টুসিকেই জাপ্‌টে ধরে—"পাকড়্‌ গয়ি! এ ভইয়া!" নিজের উচ্চকণ্ঠ ছেড়ে ছ্যায় সে এবার—ফূর্তি ওর ছ্যাখে কে!

আরেকজন পাহারাওয়ালা এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে—"এই! বাহার্‌ আও! নিক্‌লো জল্‌দি!" টুসিকে এক ঘুষি লাগায় সে কসে—"চোট্টা কাঁহাকা!"

টুসি ভেউ-ভেউ করে কাঁদ্‌তে শুরু করে।

"আরে! ই-তো রোনে লাগি! বহুৎ বাচ্চা বা!"

"বাচ্চা হোই চায়্‌ সাচ্চা হোই, লেকিন্‌ একঠো কো তো থানামে লে-যানা পড়ি।"

অপর পাহারাওয়ালাটা বলে—"এই! চলো থানামে।"

"থানাতেই তো যেতে চাচ্ছি আমি।" টুসি কাঁদতে-কাঁদতেই জানায়—"আমাকে নিয়ে যাও না থানায় ধরে-বেঁধে—এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও না।" ভারি করুণ কণ্ঠ ওর।—"বেরুতেই তো চাচ্ছি আমি।"

যদি চুরির দায়ে পড়েও মুক্তির সম্ভাবনা আসন্ন হয়, এই লৌহ-শৃঙ্খলের কবল থেকে অব্যাহতি পায়—টুসি তাতেও রাজি এখন। বেশ প্রসন্নমনেই রাজি।

দেহের সমস্ত বল দিয়ে দুই পাহারাওয়ালার দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন—কিন্তু দারুণ টানাটানিতেও বিন্দুমাত্রও টস্‌কানো যায় না টুসিকে। একচুলও এদিক্‌-ওদিক্‌ হয় না ওর।

দু'জনেই থমকে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। টুসিও।

"বড়ি জোরসে সাঁটল্ বা! ই-তো এইসা নিকল্বে না!" একজন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

অন্যজন কপালের ঘাম মোছে—"লোহা তোড়্না লাগি। মিস্তিরি চাহি ভইয়া!"

অতঃপর দু'জনের মধ্যে কি যেন পরামর্শ হয়। কানাকানি ফুরোলে দু'জনেই ওরা মুখ ব্যাজার করে—"ছোড়্ দে ভইয়া! এইসন-চোর্সে হাম্লোগোঁকো কাম নহি!"

এই বলে—'স্থানত্যাগেন দুর্জনাৎ' চাণক্যের এই নীতিবাক্য মেনে নিয়ে সরে পড়ে তারা তৎক্ষণাৎ।

চোর তো ছেড়েই গেছে, এখন পুলিসেও ছেড়ে চলে গেল, তাহলে পরিত্রাণের ভরসা আর নেই—এতক্ষণে বুঝতে পারে টুসি। কুকুর, পকেটমার, পাহারাওয়ালা—একে-একে সবাই ওকে ছেড়ে চলে যায়।

সকলের পরিত্যক্ত হয়ে একা সে দাঁড়িয়ে থাকে নির্জন পার্কের একধারে রেলিং-এর সঙ্গে একাকার হয়ে একটা আলোর দিকে তাকিয়ে—

বাতিটা দপ্ দপ্ করছে তখন থেকেই—

তার দাতুও বোধহয়···

ভোর হয়ে আসে। দু'-একজন করে লোক এসে দেখা ছায় পার্কে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব আসেন—খবরের কাগজ তাঁদের হাতে।

টুসি ঐ তটস্থ অবস্থাতেই নিজের ঘাড়ের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

একজন ভদ্রলোক ব্যাপারটা দেখতে যান—ইসারায় তিনি ডাকেন অপর সবাইকে।

ফিস্ ফিস্ করে আলোচনা শুরু হয় তাঁদের—

"সেই ছেলেটিই না? যার নিরুদ্দেশের খবর বেরিয়েছে আজকের কাগজে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"এই তো লিখেছে—'ছেলেটি শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, দোহারা বলিলে হয়তো সামান্যই বলা হয়—বরং বেশ হৃষ্টপুষ্টই বলিতে হইবে। যেমন হৃষ্ট, তেমনই পুষ্ট। অদ্য রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় ডাক্তার ডাকিবার অজুহাতে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ উক্ত শ্রীমানকে দেখিতে পান, দয়া করিয়া শ্রীমানের খোঁজ দেন, তাহা হইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কোনোরকমে ধরিয়া আনিতে পারিলে নগদ পাঁচশত টাকা পুরস্কার।"

"আরে, এই যে, এখানেও আবার! '—টুসি ভাই! যেখানেই থাক ফিরিয়া আইস। আর তোমাকে ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। তোমার দাদু আর মৃত্যুশয্যায় নেই, এখন জীবন্ত শয্যায়। সুতরাং আর কোনো ভয় নাই তোমার। কতো টাকা চাই তোমার, লিখিও। লিখিলেই পাঠাইয়া দিব'।"

"আবার এই যে—'পুনশ্চ! প্রিয় টুসি, তুমি ফিরিয়া আসিলে ভারী খুশী হইব। এবার তোমার জন্মদিনে তোমাকে একটা সাইকেল কিনিয়া দিব। যেখানে যে-অবস্থায় থাকো, লিখিয়া জানাইও। মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইব। ইতি—তোমার দাদু'।"

তাঁদের একজন খবর দিতে ছোটেন টুসির দাদুকে। বাকি সবাই টুসিকে ঘিরে আগ্‌লাতে থাকেন। কি জানি, যদি পালিয়ে যায় হঠাৎ। জেগে উঠেই দৌড় মারে যদি! ওঁরা খুব সন্তর্পণেই ওকে ঘিরে দাঁড়ান, ঘুণাক্ষরেও শব্দ হয় না—নিঃশ্বাস-ফেলার শব্দও নয়!

একজন মন্তব্য করছিলেন—"ঘুমোবার কায়দাটা দেখুন! শোবার জায়গাটিও বেছে নিয়েছে বেশ—ফাঁকা-মাঠে—খোলা-হাওয়ায়—তোফা-আরামে—মজা করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে—ছোঁড়ার ফূর্তিটা দেখুন একবার!"

অমনি আর সবাই তাঁর মুখে চাপা দিয়েছে—"চুপ! চুপ!

করছেন কি? জেগে উঠবে যে! জেগে উঠলে পালাতে কতক্ষণ? আমরা কি তখন ধরতে পারবো ওকে? দৌড়ে পারবো ওর সঙ্গে? ওর বাবার বাবাই পারেনি যেকালে··· ।"

"ধরা শক্ত বলেই তো পুরস্কার দিয়েছে ধরবার জন্যে—'কোনো-রকমে একবার ধরিতে পারিলে'—দেখছেন না?"

টুসির দাদু এসে পড়েন ট্যাক্সিতে।

নাতিকে দেখে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে—"বলে—আমি এধারে মরছি কলিকের জ্বালায়, আর উনি কিনা এখানে এসে মজা করে—আয়েস্ করে ঘুমোচ্ছেন!"

এক থাপ্পড় কসিয়ে দ্যান তিনি টুসির গালে।

"আহাহা! মারবেন না, মারবেন না!" সবাই একবাক্যে হাঁ হাঁ করে ওঠেন।

"না, মারবো না! মারবো না বইকি! মশাই, সেই দেড়টার সময় বেরিয়েছে ডাক্তার ডাকতে, দেড়টা গেল, দুটো গেল, আড়াইটা গেল, তিনটেও যায়-যায়! পাত্তাই নেই বাবুর! কলিক উঠে গেল আমার মাথায়! জানেন মশাই, পঞ্চাশ টাকার ট্যাক্সি-ভাড়া বরবাদ্ গেছে কাল একরাত্রে আমার? কলিক্ পেটে নিয়েই সেই রাত্রেই দৌড় কি দৌড়! এ-থানায়, ও-থানায়, সে-থানায়—কোনো থানাতেই নেই উনি! এ-হাসপাতাল, ও-হাসপাতাল—কোথাও নেই হতাহত হয়ে! হাত-পা কেটে পড়ে থাকলেও তো বাঁচতুম! কিন্তু তাও নেই। কি বিপদ ভাবুন তো। কি করি! গেলুম তখন খবর-কাগজের আপিসে। সেই রাত্রেই। রাত আর কোথায় তখন, ভোর চারটে! নাইট্-এডিটারের হাতে-পায়ে ধরে মেশিন্ থামিয়ে ষ্টপ্ প্রেস করে একমুঠো টাকা গচ্ছা দিয়ে তবে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপিয়ে বের করতে পেরেছি, জানেন মশাই?

একখানা আনন্দবাজার পকেটের ভেতর থেকে টানাটানি করে বের করেন তিনি।

"তবেই এই বিজ্ঞাপন বেরোয় আজকের কাগজে! আর আপনি

বলছেন কিনা, 'মারবেন না' !" তিনি আরো বেশি অগ্নিশর্মা হন। "মারবো না ? তবে কি আদর করবো নাকি ওই বাঁদরকে ?"

চড়ের চাপটেই চট্‌কা ভেঙ্গে গেছল টুসির—কিন্তু সবই ওর কেমন যেন গোলমাল ঠেক্‌ছিল ; মাথায় ঢুকছিল না কিচ্ছুই। কিন্তু এখন চোখের সামনেই স্বয়ং শ্রীদাদু এবং তাঁর বিরাশী সিক্কার একত্র যোগাযোগ দেখে তার ফলাফল অচিরেই কতদূর মারাত্মক হতে পারে, বুঝতে বিলম্ব হয় না টুসির।

এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যায় সে—লৌহ-বেষ্টনীর আলিঙ্গন-পাশ থেকে মুক্ত হবার অন্তিম-প্রয়াসে !

আশ্চয্যি ! শিকের বগল থেকে সে খুলে আসে আপনার থেকেই—অনায়াসেই ! চেষ্টা না করতেই একেবারে সুড়ুৎ করে চলে আসে। এক রাত্রেই চুপসে আধখানা হয়ে গেছল বেচারা—কাজেই আল্‌গা হয়ে বেরিয়ে আসতে দেরি হয় না তার।

আর দাদুর ঘুষি টুসির কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই সে সরেছে ! সরেছে উদ্দাম-গতিতে।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে টুসি পার্কের অন্য পারে ! রেলিং টপকাবার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, সন্নিহিত আরেকটা শিকের উন্মুক্ত আহ্বান উপেক্ষা করে, এমন কি আরেকটা ছেলেপিলের যাতায়াতের ফাঁকের প্রলোভন সংবরণ করেই টুসি এবার সদর-গেট দিয়েই বেরিয়ে গেছে সটান্।

বেরিয়েই ছুট্-কি-ছুট্ ! ডাইনে না, বাঁয়ে না, সোজা বামাপদ-বাবুর বাড়ির দিকে।

ওর দাদু এদিকে গজ্‌গজ্ করতে থাকেন—"বাবু এখন বাড়ি গেলেন তো গেলেন। না গেলেন তো ওঁরই একদিন, কি আমারই একদিন।"

একজন এগিয়ে গিয়ে বললে সাহস করে—"আপনার নাতি যে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল মশাই !"

উনি গর্জন করেন—"নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বলেই তো বেঁচে

গেল এ যাত্রা। নইলে কি আর আস্ত থাকতো ও? দেখেছেন তো সেই চড়খানা? সেই নাতিবৃহৎ চড়? তার পরেও কি কোনো নাতির উদ্দেশ পাওয়া যেতো এতক্ষণ?"

গুম্ হয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসেন তিনি।

"কিন্তু ও মশাই, পুরস্কার? আমাদের পুরস্কার?"

দু'চারজন দৌড়োয় ওঁর পেছনে পেছনে। ছাড়বার মুখে ট্যাক্সিটা "ভর্-ভরর্—ভর্র্—র্র্র্র্র্—"ভরাট গলার এক আওয়াজ ছাড়ে, আর সেই সাথে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দ্যায় ওদের মুখে।

টুসির দাদুকে ধরেছে এবার এক অদ্ভুত ব্যারামে—এক-আধদিন নয়, প্রায় মাসখানেক থেকে কিছুতেই ঘুম হচ্ছে না ওর। কত ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ ও হাতুড়ে—নামজাদা আর বেনামজাদা—নানারকমের চিকিৎসা করে করে হদ্দ হয়ে গেল—কিন্তু অসুখ—সারার নামটি নেই কো। এই একমাসে এক ডিসপেন্সারি ওষুধই গিলে ফেললেন তিনি, কিন্তু অসুখ একেবারে অচল অটল—যেমনকে তেমন।

ঘুম আর তাঁর হয় না। রাত্রে তো নয়ই, দিনের বেলায় দুপুরে কিংবা বিকেলের দিকে - তাও না। ভোরবেলায়, কি সকালে ঘুম ভাঙবার পর, কিংবা রাত্রে খাবারের ডাক আসবার আগে—যে সব অর্ধোদয়যোগে টুসির এবং সব স্বাভাবিক মানুষেরই স্বভাবতঃই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, গাঢ়নিদ্রা আপনা থেকেই আরো জমে, তিনি আপাদমস্তক চেষ্টা করে দেখেছেন, কিন্তু না, সে-সব মাহেন্দ্রক্ষণেও ঘুম তাঁর পায় না, এমন কি, টুসির পড়ার টেবিলে বসেও দেখছেন, টুসির পরামর্শমতই, কিন্তু সব প্রাণপণ প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে তাঁর। অবশেষে তিনি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছেন—

"যখন হকিমি দাবাই ই দাবাতে পারলো না, তখন এ-রোগ বুঝি আর—"

বাক্যটার তিনি আর উপসংহার করেন নি, নিজেকে দিয়েই তা করতে হবে হয়তো, এই রকমই তাঁর আশঙ্কা।

"ডাক্তারিতেই কি হবে? বলে, পুরো একটা ডিস্‌পেন্‌সারিই সরিয়ে ফেল্‌লাম—হ্যাঁ!"

"কোথায় সরালে দাদু? কই আমি তো জানি না।" বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করে টুসি—দাদুর এবংবিধ কার্যকলাপ সে তো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কখনো।

"কোথায় আবার! আমার এই পেটেই—পেটের মধ্যেই!"

"ও, তাই বলো।"

"তবুও সারলো না অসুখ।"

দাদুর খেদোক্তিতে টুসির মন কেমন করে। তাই এবার সে নিজেই দাদুর চিকিৎসার ভার নেবে; এইরকমই সে স্থির করেছে। তখন থেকেই সে দস্তুরমতো মাথা ঘামাতে লেগেছে। স্কুলের টাস্ক, মার্বেল-খেলা, ঘুড়ি-ওড়ানো, এমন কি সুযোগ পেলেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সব জরুরি কাজ ফেলে রেখে কেবল ওর দাদুকে ভাল করার কথাই সে ভাবছে এখন। কতকগুলো উপায় মনেও যে আসেনি তার তা নয়। কোন্ সম্রাট অসুস্থ ছেলের বিছানার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে ছেলেকে আরাম করে এনেছিলেন—সেই ঐতিহাসিক চিকিৎসা-পদ্ধতিটা পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? অসুখ সারাবার এইটেই তো সবচেয়ে সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়, তার মনে হতে থাকে। এক্ষুনি—আজ রাত্রেই, বা যে কোন সময়ে দাদু খানিকক্ষণের জন্যে একটু চোখ বুজোলেই এই চিকিৎসা সে শুরু করে দিতে পারে।

কিন্তু দাদু যে চোখই বোজায় না ছাই! এক মিনিটের জন্যেও না।

তখন মরিয়া হয়ে আর কোনো উপায় না দেখে সে সজাগ দাদামশায়ের চারদিকেই প্রদক্ষিণ লাগিয়ে দ্যায়, কিন্তু দাদুর চোখও ঘুরতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে।

"এই! এই! ওকি হচ্ছে? ঘুর্ণি লেগে পড়ে যাবি যে—আমার ঘাড়েই ঘুরে পড়বি থাম্-থাম্।"

বাধা পেয়ে সে বসে পড়ে লজ্জিত হয়ে—থামের মতই বসে যায়। ঘুরপাকের রহস্য দাদুকে জানাবার তার আর উৎসাহ হয় না। কে জানে, কি ভাববে দাদু?

আচ্ছা, সেই রেলিং-চিকিৎসাটা কেমন? হঠাৎ তার মনে পড়ে এখন। এক গভীর-রাত্রে দাদুর জন্যে ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে বেরসিক এক কুকুরের পাল্লায় পড়ে হন্তদন্ত হয়ে পার্ক ভেদ করে যাবার মুখে রেলিংয়ের ফাঁকে আটকে গেছল সে—না পারে রেলিংকে বাড়াতে, না পারে নিজেকে ছাড়াতে। কিন্তু সেই অবস্থায় সটান দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কী তোফা ঘুমটাই না দিয়েছিলো সে। তেমন ঘুম তার কোনোদিনই হয়নি আর। কখন কোন্ ফাঁকে যে ভোর হয়েছে, টেরই পায়নি টুসি; কিন্তু—

হতাশভাবে সে ঘাড় নাড়ে। নাঃ, এ-চিকিৎসায় রাজি করানো যাবে না দাদুকে। দাঁড়াবার জন্যে ততটা নয়, কেননা, বলতে গেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই আমরা ঘুমুই, যদিও সে হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে দাঁড়ানো, কিন্তু টুসি ভেবে ছাখে, রেলিংএর কবলে ঐরকম লটকে থাকাটা একেবারেই পছন্দ করবেন না দাদামশাই। ওর নিজেরই তো পছন্দ হয়নি প্রথমটায়।

তবে—তবে? আর কি কোনো উপায় নেই? ভয়ানকভাবে ভাবতে থাকে টুসি। ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সে তো আর ছাড়তে পারে না—যেহেতু দাদুর যা-হাল্, তাতে হাল ছেড়ে দেওয়া মানে দাদুকে ছেড়ে দেওয়া। আর দাদুকে ছাড়ার কথা ভাবতেই দেদার কান্না পায় তার।

"আচ্ছা দাদু, এক কাজ করলে হয় না—?"

"কি কাজ?"

আমতা আমতা করে কোনোরকমে বলে ফেলে টুসি—নতুন একটা বুদ্ধি খেলেছে ওর মাথায়—"সেই যে এক রাত্তিরে তোমার

কলিকের জন্যে ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছিলাম, রাস্তায় দেখেছিলাম কি, বড়ো রাস্তাতেই দেখেছিলাম, ফুটপাথের ওপর, সারা ফুটপাথ জুড়ে কত লোক যে শুয়ে আছে, একফুট পথও ফাঁক রাখেনি। আর তারা শুয়ে আছে দিব্যি আরামে, বালিশের বদলে মাথায় কেবল একখানা করে ইঁট দিয়ে। অক্লেশে ঘুম দিচ্ছে—খাসা ঘুমোচ্ছে তারা—কুকুর ফুকুর কারু কোনো তোয়াক্কা না করেই—"

"ফুটপাথে গিয়ে আমি শুতে পারবো না বাপু! তা তুমি যাই বলো! তা চাই আমার ঘুম হোক, আর নাই হোক—"

"না-না ফুটপাতে কেন, আমার মনে হয় কি জানো দাদু, ফুটপাথ নয় ঐ ইঁটের সঙ্গেই ঘুমের কোন যোগাযোগ আছে। একটা শক্ত জিনিসে মাথা রাখলে ঘুম না হয়েই পারে না—জানো দাদু, ইস্কুলের ডেক্সওয়ালা বেঞ্চে বসে বইয়ের গাদায় মাথা রেখে ছেলেরা কেমন তোফা ঘুমোয়—মাষ্টার ক্লাসে এলেও টের পায় না। পাশে এসে দাঁড়ালেও না। এমন কি, তখনো তাদের নাক ডাকতে থাকে, মাষ্টারের হাঁকডাকেও ঘুম ভাঙ্গে না। জানো ?

দাদু ভুরু কুঁচকে ব্যবস্থা-পত্রটা ভেবে দ্যাখেন।

টুসি উৎসাহ পায়—"বুঝেছো দাদু, ঐ পুরু বালিশের জন্যেই ঘুম হচ্ছে না তোমার! যা নরম! যখন আমার মাথার তলায় বালিশ থাকে না, চৌকির তলায় চলে যায়, তখনই আমি দেখেছি—আমার ঘুম সবচেয়ে ঘনো হয়—বুঝেছো দাদু!"

"যা তবে, নিয়ায় ইঁট!" চালাও হুকুম দিয়ে দ্যান দাদু।—"রাস্তা থেকেই আন্‌বি তো? ভালো দেখে আনিস কিন্তু। দেখে শুনে ভালো করে বাজিয়ে—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে—বুঝলি? হ্যাঃ, রাস্তার ইঁট আবার ভালো হবে? কিন্তু কি আর করা, উপায় তো নেই!"

"মনোহারি দোকানে তো কিনতে পাওয়া যায় না ইঁট।" টুসি জানায়।

"তবে যা, তাই নিয়ে আয়গে—সাবান দিয়ে সাফ করে নিলেই হবে। যা।"

বলতে না বলতেই দৌড়োয় টুসি! একখানা আঠারো ইঞ্চি, একটুক্রো কার্বলিক-সোপ আর তিনখানা চন্দন-সাবান আর পমোলিভ নিয়ে আসে সেই সঙ্গে। প্রথমে কার্বলিকটা দিয়ে ইঁটের যত জীবাণু-ছাড়ানো, তারপরে পামোলিভ ঘসে-ঘসে কার্বলিকের গন্ধ-তাড়ানো। সবশেষে চন্দন মাখিয়ে সুরভিত করা।

"দেখেছো দাদু! সাবান মাখিয়ে-মাখিয়ে কিরকম করে ফেলেছি ইঁটখানাকে!"

দাদু শুঁকে ছাখেন একবার—"হুম্! বেশ উপাদেয়ই হয়েছে বটে।"

রাজভোগ্য ইঁট-মাথায় সারারাত কেটে যায় দাদুর—কিন্তু ঘুমোবার ভাগ্য তাঁর হয় না। একপলের জন্যেও চোখের পলক পড়ে না তাঁর।

সকালে উঠেই তাঁর গজগজানি শুনতে হয় টুসিকে—"হ্যাঃ, ইঁট না ছাই! ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে সব্বাই! দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে তারা! কি দেখতে কি দেখেছেন, তার নেই ঠিক! মাঝখান থেকে আমার—উঃ! সেই তখন থেকেই মাথাটা যা টাটিয়ে আছে—বাপ্!" বলে মাথার বদলে ঘাড়েই হাত বুলোতে থাকেন তিনি।

"উঃ, কী মাথাটাই না ধরেছে! · ক্যাফিয়াস্পিরিন? ক্যাফিয়াস্পিরিনে কী হবে আমার? ক্যাফিয়াস্পিরিন্ কে কিনে আন্তে বললো তোকে? একি তোর সেই আধকপালে? বলছি না—মাথা ধরেছে? সমস্ত মাথাটাই—এই ঘাড়ের এখান থেকে ও ঘাড় পর্যন্ত। ক্যাফিয়াস্পিরিনে কি করবে এর? ও-তো মাথা ধরা সারায়। ঘাড়-ধরা কি সারায় ওতে? অ্যাস্পিরিন-ট্যাস্পিরিমের কম্মো নয় বাপু!"

"ঘাড়ের দুধারই গেছে তোমার, বলছো কি দাদু?"

"ধরবে না? ইটখানা কি একটুখানি?" দাদু ঘাড় নাড়েন।

"মাথার আগাপাশতলা ধরেছে, কিন্তু যাঁর ধরবার কথা ছিল—নিদ্রাদেবী, যদিও-বা তিনি আসতেন, কিন্তু ইঁটের বহর দেখে ত্রিসীমানার মধ্যেও আর ঘেঁষ ছ্যাননি"—ইত্যাকার নিজের মতামত প্রবলভাবে ব্যক্ত করতে থাকেন ওর দাদু।

টুসি? টুসি আর কি করবে? চুপ করে শুনতে থাকে। ইঁটের অপরাধ অম্লানবদনে নিজের ঘাড় পেতে ন্যায়।

কয়েকদিন পরে একরাত্রে দাদু অনিদ্রার আতিশয্যে ছট্‌ফট্‌ করছেন, পাশের বিছানায় শুয়ে ওর নিজের চোখেও ঘুম নেই—ভয়ে-ভয়ে একটা কথা বলে ফ্যালে টুসি—

"আচ্ছা দাদু, তুমি উপক্রমণিকা পড়ে দেখেছো কখনো? সত্যি—সমস্কৃত পড়তে বসলেই এমন ঘুম পায়, অ্যাতো ঘুম পায় যে কী বলবো!"

কথাটা মনে ধরে ওর দাদুর। টুসির দিদিমা বই হাতে নিয়ে দিবানিদ্রা শুরু করতেন, স্মরণ হয় ওঁর। প্রত্যহই প্রথম পাতা থেকে হরিদাসের গুপ্তকথা তাঁর আরম্ভ হোতো, কিন্তু কোনোদিনই আড়াই পাতার বেশী এগুতে পারতেন না; বলতেন—'আঃ কী ঘুমটাই না আছে ঐ বইটাতে!' অবশেষে গুপ্তকথা অজ্ঞাত রেখেই একদা ওঁকেই ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়েছে, কোন্ গুপ্ততর জগতে চলে যেতে হয়েছে, ভেবে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দাদুর চোখ। একদিন সেই বইখানা খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেদিন দুপুরে, কী আশ্চয্যি, ঘুম তো হোলোই না বৌয়ের, উপরন্তু তার বদলে তাঁর সঙ্গে বকাবকি করে অম্বল হয়ে গেল শেষটায়।

"যা, নিয়ায় তো! উপক্রমণিকাকেই দেখবো আজ।"

টুসি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওর দাদু মাথার কাছে আলো জ্বেলে উল্টে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা—উপক্রমণিকাও শেষ আর

রাতও কাবার ! বাস্তবিক, কী চমৎকার বই এই উপক্রমণিকা, ঘুম না হোক, দুঃখ নেই, কিন্তু কী ভালোই লেগেছে যে দাদুর ! সন্ধি-বিধি ও ষত্ব-ণত্বের অনুক্রম থেকে শুরু করে—দ্বন্দ্ব ও মধ্যপদলোপী এবং যাবতীয় সমাসকে অবলীলায় অতিক্রম করে, নরঃ-নরৌ-নরাঃ এবং লট্-লোট্-লঙ্-বিধিলিঙের ব্যূহভেদ করে বীরবিক্রমে এগিয়েছেন তিনি, তুদাদি ধাতু থেকে তদ্ধিত-প্রত্যয় পর্যন্ত পার হয়ে গেছে তাঁর, সহজেই হয়ে গেছে ; ণিজন্ত-প্রকরণ ও পরস্মৈপদীর ব্যাপারটাও বেশ হাড়ে-হাড়েই বুঝেছেন, অবশেষে কর্মবাচ্য ও কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে ঠেকেছেন এখন। আগাগোড়া সবই তিনি পড়েছেন সাগ্রহে। পড়েছেন আর ভেবেছেন। ভেবেছেন আর অবাক্ হয়েছেন। কত সত্য, কত তত্ত্ব, কত রহস্য, কী গভীরত্বের পরিচয়ই না নিহিত আছে ওর পাতায়-পাতায় ! ওর বিধি-বিধানে জীবনের কত জটিল সমস্যার সমাধানই না খুঁজে পেলেন তিনি। বাস্তবিক, ওকে ব্যাকরণ না বলে ব্যাকরণ-দর্শনই যদি ষড়্দর্শনের তালিকায় আরেকটা সংখ্যা বাড়াতে হয়—বাড়িয়ে বলা উচিত, এর জন্যে সপ্তম দ্রষ্টব্যের আমদানি করতে হয়—তবুও। আহা ! যদি অবহেলা না করে ছেলেবেলায় এই সদ্গ্রন্থ মন দিয়ে পড়তেন !—

তাহলে কী যে হোতো, আজ তা অবশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেন না। সকালে উঠে টুসি, দাদুকে নিদ্রিত না দেখুক, কিন্তু খুশী দেখেছে। পুলকিত না দেখতে পাক, অন্ততঃ তিতবিরক্ত দেখতে হয়নি।

উপক্রমণিকা মুখস্থ করেও যখন বিনিদ্রার ব্যতিক্রম দেখা গেল না, তখন অন্য প্রস্তাব পাড়ে টুসি। খেলাধুলো করলে কেমন হয় ? ফুটবল কি টেনিস্ বা ঐরকমের একটা কিছু ? ফুটবল খেলে ফিরলে কেমন গা ঝিম্‌ঝিম্ করে। আপনা থেকেই চোখের পাতা জড়িয়ে আসে টুসির ! সেইজন্যেই তো সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বসেই সেই যে সে চেতনা হারায়, রাত্রে খাবার সময় অমন ষাঁড়ের ডাকা-ডাকিতেও সহজে তার সাড়া জাগে না।

"মাঠে গিয়ে তোমার মতন বল পিট্‌তে পারবো না বাপু। ওসব গোঁয়ারদের খেলা। যতোসব গুণ্ডারাই খ্যালে! তারপর ল্যাং মেরে ফেলে দিক্ আমায়! ফেলে আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিক্ আর কি!" দাদু মুখ ব্যাঁকান।

"মাঠে কেন দাদু? ছাদে? আমাদের বাড়ির ছাদেই।" টুসি তাঁকে আশ্বস্ত করে। "আর কেউ না, কেবল তুমি আর আমি।"

"হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে! কিন্তু দেখো বাপু, কেয়ারি করতে পাবে না. ফাউল-টাউল করা চলবে না তা বলে। আর—" দাদু শেষ পর্যন্ত খোলসা করেই বলেন—"আর আমাকেও বল মারতে দিতে হবে—মাঝে-মাঝেই।"

"বাঃ, তুমিই তা মারবে! তোমারই তো দরকার এক্‌সার-সাইজের।" টুসি বিশদ করে দ্যায়—"ভয় নেই, আমি একলা-একলা খেলবো না।"

"আমিও গোল দেবো কিন্তু! আমাকেও গোল দিতে—দিতে হবে! হ্যাঁ!"

"বেশ তো, তুমিই খালি গোল দিয়ো। আমি একটাও গোল দেবো না তোমায়।" গোড়াতেই অভয় দিয়ে টুসি গোলোযোগ থামায়।

তারপরে পাড়ার এক টেনিস্-ক্লাব থেকে ব্যবহৃত ও বহিষ্কৃত একটা ডিউস্ বল যোগাড় করে হাজির হয় টুসি।

"অ্যাঁ! এত ছোটো যে?" দাদু অবাক্ হন—"ফুটবল এত ছোটো কেন রে?"

"ফুটবল না তো।" টুসি জানায়, "ছাদে কি অত বড়ো ফুটবল চলে কখনো? আমার এক শূটে তাহলে তো কোথায় উড়ে যাবে, তার ঠিক নেই। তাই টেনিসের বল নিয়ে এলাম। টেনিস্ই বা মন্দ কি?"

"তা মন্দ কি!" দাদুও সায় দেন—"তবে টেনিস্ই হোক, ক্ষতি কি?" ফুটবল সম্পর্কে ব্যাটবল আর টেনিস্, টেনিস আর ক্রিকেট,

ক্রিকেট আর হকি—ওদের তারতম্য আর বিশেষত্ব কেবল নামমাত্র নয়, ভালোভাবেই দাদুর জানা; ওদের ভেদাভেদের সব খবর—সমস্ত রহস্য—কিছুই তাঁর অবিদিত নেই।

তারপর থেকে দুপ্‌দাপ্‌, ধুপ্‌ধাপে পাড়ার লোক সচকিত হতে থাকে প্রত্যহ। বাড়িওয়ালা এসে বলেন—"ছাদ ভেঙ্গে ফেলবেন দেখছি। কি হয় আপনাদের—ফুটবল-খেলা?"

"ফুটবল? না তো।" দাদুর চোখ কপালে ওঠে—"ফুটবল! রামোঃ! ফুটবল আবার খ্যালে মানুষে? ওতো গোঁয়ারদের খ্যালা মশাই! আমরা টেনিস খেলি। আসবেন, আপনিও আসবেন—তিনজনেই খ্যালা যাবে না হয়।"

বাড়িওয়ালাকে নিমন্ত্রণ করে তো বসেন, কিন্তু সন্দিগ্ধভাব একটা থেকেই যায় তাঁর। আপনমনেই বলেন তিনি—"আসবেন তো খেলতে, তবে টুসির সঙ্গে পেরে উঠলে হয়! আমি যে আমি—আমাকেই বলে গলদঘর্ম করে দিচ্ছে!"

বাড়িওয়ালা আসেন বিকেলে, ঈষৎ আপ্যায়িত-হাসিমুখ নিয়েই—"হ্যাঁ! বাড়ির ছাদ আমার বেশ বড়োই, টেনিস খ্যালা যায় বটে। তবে আপনারাই খেলুন, আমি দেখি। এই স্থূলদেহ নিয়ে এ-বয়সে আর ঐসব খ্যালাধুলোর হুলস্থূল আমার পোষায় না মশাই!"

টেনিসের বল পড়ে ছাদে। বলটাকে রাখা হয় সেণ্টারে—নাতি আর দাদু দু'জনেই মুখোমুখি হন—নাতিবৃহৎ কুরুক্ষেত্রের সম্মুখে।

"নেট্‌ কই মশাই—নেট্‌?" বাড়িওয়ালা একটু বিস্মিতই।

"নেট্‌? নেট্‌ আবার কি? নেট্‌ কেন? নেট কি হবে? কিসের নেট্‌?" দাদুও কম বিস্মিত নন।

"কেন, টেনিসের নেট্‌?" বাড়িওয়ালা বলেন। "বলই তো দেখছি কেবল—তাও তো কুল্লে একটাই। র‍্যাকেট্‌ই বা কোথায়?"

ততক্ষণে খ্যালা শুরু হয়ে যায় ওঁদের। খেল্‌তে-খেল্‌তেই বলেন দাদু—বলের সঙ্গেই তাঁর গলা চলে—

"ও, ব্যাটের কথা বলছেন? আমাদের তো এ ব্যাট্‌বল-খ্যালা নয় মশাই! ভুল করছেন আপনি—খ্যালার কোনো খবর তো রাখেন না! আর কি করেই বা রাখবেন—এসব খ্যালাধুলো তো আর ছিল না আপনাদের কালে! তাই এসব খ্যালার নামধাম জানার কথাও নয় আপনার। আরে মশাই—আমরা টেনিস খেলছি যে। ওই যাঃ! দেখুন তো—গোল দিয়ে দিলে—বকতে বকতে সামলাই বা কখন ছাই!"

আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে গোলের মুখে গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ান তিনি। দুদ্দাড় করে বল পিটিয়ে আনছে টুসি, কোন্ ফাঁকে যে গোল দিয়ে বসে—কিসের ফাঁকতালে যে ফের আবার গোলোযোগ ঘটায়, ঠিক নেই আর! তর্ক মাথায় রেখে এখন সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

বাড়িওয়ালা চটেই যান, তাঁর নিজের বাড়ির ওপর এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হয় না। বাড়ির মায়ার জন্যে ততটা না; যেরকম খ্যালার দাপট, তাতে এর ইহকাল, পরকাল—সমস্তই ঝরঝরে। এ বাড়ির ভবিষ্যতের আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছেন—খেলোয়াড়দের সবতলার জন্যেই ছাড়তে হয়েছে; কিন্তু তাহলেও টেনিস-বলের প্রতি ফুটবলের ন্যায় এই দুর্ব্যবহার তাঁর সহ্য হয় না—এইটেই সবচেয়ে তাঁর প্রাণে ব্যথা ছ্যায়।

ঘুম না হোক, খ্যালার ফল অবিশ্যি একটা দেখা যায়—সেটাকে হয়তো সুফলই বলা যেতে পারে।

টুসির দাদু আর অভিযোগ করেন না, নিদ্রাহানির জন্যে কোনো ক্ষোভের বাণী আর শোনা যায় না তাঁর।—"নাই হোকগে—ঘুম না হয় নাই হোলো, না হোলো তো বয়েই গ্যালো আমার। ঘুমের দরকারই বা কি? ঘুমিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে? দুদ্দূর—ঘুমোয় আবার মানুষে! গরু, ঘোড়া, ছাগল আর গাধাই খালি ঘুমিয়ে সময় বাজে নষ্ট করে।" এবংবিধ সব বাক্যই বরং তাঁর মুখে এখন।

আজকাল সকাল থেকেই শুরু হয় তাঁর উপক্রমণিকা-পাঠ, এক-রকম নিত্য-ক্রিয়ার মধ্যে ; আর বিকেলে টুসি ইস্কুল থেকে ফিরলে পরে টেনিস-পর্ব—সেটাকে নৃত্য-ক্রীড়া বলা যেতে পারে। আর রাত্রে ? সারারাত তাঁর চোখে তো ঘুম নেইই, টুসিরও ঘুমের দফা রফা।

কোন্ গোলটা তাঁকে নিতান্ত অন্যায় ভাবে দেওয়া হয়েছে, কোন্‌টাকে আর একটু হলেই নির্ঘাৎ বাঁচানো গিয়েছিল, কোন্ গোলটার পায়ের ফাঁকের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়ার অপরাধ কিছুতেই তিনি মার্জনা করতে পারেন না, এমন না জানিয়ে সুড়ুৎ করে চলে গেল যে হঠাৎ! কোন্ অবশ্যম্ভাবী গোলকে তিনি অকস্মাৎ দু'পা জুড়ে দিয়ে ফসকাতে ছাননি, একেবারে গোল দেবার কি-কি নতুন কায়দা তিনি আবিষ্কার করেছেন, কোন্‌টাকে তিনি কৃপা করে ছেড়ে দিয়েছেন—বলের প্রতি, না টুসির প্রতি কৃপাবশেই, কোন্ গোলটা তিনি নিজেই, হ্যাঁ, তিনি নিজেই তো—আর একটু হলেই প্রায় দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি—বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেইসব আলোচনায় টুসিকে যোগ দিতে হয় তাঁর সঙ্গে।

"আচ্ছা, ফুটবলেও তো গোল ছায় বলে শোনা যায়? ছায় তো? টেনিসেও ছায়। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে। ফুটবলের গোলে তাহলে প্রভেদ কোথায়? দুটোর আকারে আর ওজনে তফাৎ আছে বটে, তা ঠিক! যদিও দুটোই গোলাকার, তাহলেও ভারি গোলমাল ঠ্যাকে ওর দাদুর। দুটো খ্যালাতেই যখন গোল দেবার প্রথা এক, প্রকার-ভেদ নেই, তখন আলাদা নামকরণ কেন? বলের আকার-ভেদের জন্যেই কি তাহলে?"

দাদুর জিজ্ঞাসার কি জবাব দেবে টুসি? শুনতে-শুনতে নাজেহাল হয়ে পড়ে সে।

প্রহরের পর প্রহর চলে যায়—অফুরন্ত বাক্যালাপ আর ফুরোয় না। হঠাৎ ওর দাদু মোড় ঘোরেন—"তদ্ধিত-প্রত্যয় জানিস? জানিস না কি? জানিস ; আচ্ছা, বল্ তো তাহলে—লকারার্থ-নির্ণয় কাকে বলে?"

খ্যালার ঠ্যালা তবুও ভালো, উপক্রমণিকার উপক্রমেই গলা শুকিয়ে আসে টুসির। ক্ষীণস্বরে সে জানায়—"উঁহুঁ।" নিজের প্রতি তার একটুও প্রত্যয় আছে বলে মনে হয় না।

"বটবৃক্ষ সন্ধিবিচ্ছেদ কর্ তো। করতে পারিস?" খ্যালার থেকে এখন ব্যাকরণে নেমেছেন ওর দাদু। "দেখেছিস করে?"

ভালো করেই ছ্যাখে টুসি। বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা—গুঁড়ির থেকে শুরু করে মায় গাছের ডগা অব্দি, পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও বাদ রাখে না, কিন্তু কোত্থাও কোনো বিচ্ছেদের আভাস-মাত্রও তার নজরে পড়ে না।

"পারলিনে তো? বটু ছিল ঋক্ষ, হোলো গিয়ে বটবৃক্ষ—দেখলি?"

ওর দাদু জোর দিয়েই জানাতে চান যে এটা হোলো গিয়ে স্বরসন্ধি, নিশ্চয়ই এবং এর কোনো ভুল নেই—কিন্তু মানতে কিছুতেই রাজি হয় না টুসি। অদৃশ্য সন্ধিতে সে ঘোরতর অবিশ্বাসী। ওর মতে—যদি তাই হয়, তবে নিছক এটা দাদুর অভিসন্ধি কেবল।

সেও পাল্টা প্রশ্ন করে বসে দাদুকে—"আচ্ছা, Buchanan সন্ধি-বিচ্ছেদ করো তো তুমি!"

"বুচানন? এ আর এমন শক্তটা কি? বুচা ছিল আনন, হোলো গিয়ে বুচানন—যেমন পঞ্চানন আর কি! আবার সমাসও হয়—বুচা আনন যাহার, সেই বুচানন; কিন্তু কি সমাস, কে জানে! দ্বন্দ্ব না বহুব্রীহি?" ওঁর নিজেরই কেমন খট্‌কা লাগে। "মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ও হতে পারে।" সমাস প্রকরণটায় এখনো উনি তেমন পাকা হতে পারেননি, অকালপক্ক এখনো—টুসির মতোই! ভালো করে পোক্ত হতে কমাস লাগে, কে জানে!

হঠাৎ ওঁর প্রাণে সন্দেহ জাগে—"আমাদের পাড়ার সেই ফিরিঙ্গিটা নয়তো? বুচানন সাহেব? সাবধান, ওর সঙ্গে যেন কোনো সন্ধি বাধাতে যেয়ো না বাপু। মারখুনে মানুষ—কাণ্ডজ্ঞান-হীন—কখন কি করে বসে, তার ঠিক নেই!"

নাতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি সাবধান করে ছান।

"আচ্ছা, উপসর্গ কয় প্রকার বল্ তো?"

পর-পর তিনবার একটা বেজে গেছে ঘড়িতে—সাড়েবারোটার, একটার এবং দেড়টার ঘন্টা—সেও হয়ে গেল কতোক্ষণ! ঘুমে সারাদেহ জড়িয়ে আসছে টুসির—এখন উপসর্গে কেন—সোজা স্বর্গে যেতে বললেও সে রাজি নয়, শক্তিও নেই তার।

"আমি বলে যাচ্ছি, তুই গুণে যা। প্র, পরা, অপ, সং—"

ঘুমের ঘোরেই শুনতে থাকে টুসি। ক'টা হোলো উপসর্গ সবসুদ্ধু? দশটা না ছ'শোটা? ওর নিজেকে নিয়ে? দাছুকে ধরে' না বাদ দিয়ে? আর বুচানন? সেও তো দেখতে অনেকটা সঙের মতোই! সঙ্ও তো একটা উপসর্গ? বুচানন তাহলে উপসর্গ। আর বটবৃক্ষ? বটগাছের তদ্ধিত হয়? বুচাননের?....

"· উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ! কিরে? গুণলি? কটা হোলো? আরে মোলো যা, এ যে নাক ডাকাতে লেগেছে!"

দেখতে না দেখতে আরেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে টুসির। নাঃ, ভারী ঘুম-কাতুরে হয়েছে ছেলেটা! এই কথা বল্ছে—বল্তে-বলতে—এই ঘুম। দনরাতই ঘুমুচ্ছে! আশ্চয্যি! ঘুমিয়ে কী সুখ পায় এরা? ঘুমিয়ে হয় কি, অ্যা? নাক-ডাকানো সময়ের নাহক্ অপব্যয়! নাঃ, ঘুমিয়েই ফতুর—মানুষ আর হোলো না ছোঁড়াটা। কড়িকাঠের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে থাকে দাছুর।

সকালে টেবিলে বসে মলিনমুখে দৈনিক কাগজের পাতা ওলটায় টুসি। এত বড়ো আনন্দবাজার সাম্নে, তবু সে নিরানন্দ। দাছুর অসুখ সারাতে গিয়ে নিজের সুখও তার গ্যাছে। হঠাৎ বিজ্ঞাপনের এক জায়গায় তার চোখ গিয়ে আটকায়—'স্বামীজীর অদ্ভুত যোগবল!' পড়ে উৎফুল্ল হয়ে দাছুকে লুকিয়ে সেই ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে ছায় তক্ষুনি।

পরদিন প্রাতঃকালেই নশ্বর-দর্শন স্বামীজীর প্রাদুর্ভাব হয় তাদের বাড়িতে।

"কি চাই আপনার ?"

"জয়োস্তু! আপনার দৌহিত্রের আহ্বানেই আসা। তার পত্রে আনুপূর্বিক সমস্তই প্রণিধান করেছি। অত না লিখলেও হোতো—যোগবলেই জানতাম সব।"

"কী ? হয়েছে কী ?" দাদু একটু ভীতই হন।

"আপনার দুঃসাধ্য ব্যাধি—তবে ও আমি সারিয়ে দেবো। যোগবলে সবই সম্ভব। শুধু যোগবলেই সম্ভব।"

"কিছু তো বুঝতে পারছি না মশাই!" থতমত খান উনি।

"সন্ত্রস্ত হবেন না।" তখন স্বামীজীই সমস্ত বুঝিয়ে দ্যান বিশদ ব্যাখ্যায়—এই যে নিদ্রাহীনতা, এ সামান্য ব্যাধি নয়, আশু না সারালে এতেই গতাসু হবার ধাক্কা! যোগের দ্বারাও নিদ্রা আনানো যায়, যাকে বলে যোগনিদ্রা, নিদ্রাযোগের সঙ্গে অবিশ্যি তার অগাধ পার্থক্য ; যোগবলে মানুষকে, এমন কি, চিরনিদ্রায় পর্যন্ত অভিভূত করে দেওয়া যায়, যদিচ বলযোগেও সেটা সম্ভব, কিন্তু দুইয়ের ফারাক বহুৎ। উনি ইচ্ছা করলে টুসির দাদুকে এই মুহূর্তেই নিদ্রালু করে দিতে পারেন।

কিন্তু সন্ত্রস্ত হতেই হোলো ওঁকে—"কি আলু ?" আলুত্বে পরিণতির ভয়াবহ আশঙ্কায় তাঁর চোখ-মুখ তখন বেগুনের মত নীল হয়ে গেছে।

"নিদ্রালু। এক্ষুনি হঠযোগের সাহায্যে আপনার ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি আমি।" সহজ করে বলেন স্বামীজী।

"কি যোগ বললেন ?"

"হঠযোগ।"

"ওতে কিস্সু হবে না।" হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন টুসির দাদু। "ইঁটযোগ করে দেখা হয়েছে মশাই, কিস্সু হয়নি।"

ইঁটযোগ বলতে স্বামীজী কি প্রণিধান করলেন, স্বামীজীই জানেন,

কিন্তু তারপরই তিনি ইঁটযোগ আর হঠযোগের পার্থক্য, প্রথমোক্তের চেয়ে শেষোক্তের শ্রেষ্ঠতা, যোগের পরম্পরা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বোঝাতে অগ্রসর হন। টুসির দাদুর প্রথমে সংশয়, তারপরে সন্দেহ, তারপরে একটা বিজাতীয় রাগ হতে থাকে। অবশেষে স্বামীজী যখন টাকাকড়ির প্রস্তাবে আসেন, যোগ থেকে একেবারে বিয়োগের ব্যাপারে—হঠযোগের ক্রিয়াকলাপে কি কি এবং কত কত খরচ, তখন আর আত্মসংবরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

"কী? জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? বোকা পেয়েছ আমায়? বটে?" বোমার মতন ফাটেন তিনি—"নিয়ায় তো টুসি, সেই ইঁটখানা! ইঁটযোগ কাকে বলে, একবার বুঝিয়ে দিই লোকটাকে।"

"অপমান-সূচক কথা বলবেন না বলছি।" স্বামীজীও চটে যান।—"তাহলে আমি রাগান্বিত হয়ে যাব এবং এই মুহূর্তেই আপনাকে হয়তো ভস্—"

ভস্মীভূত করার আগেই ফস্ করে তাঁকে থামতে হয় হঠাৎ। সেই মুহূর্তেই টুসি-হস্তে ইঁটের প্রবেশ হয়।

"আহা, ক্রোধ-পরবশ হচ্ছেন কেন! ক্রোধ-পরবশ—" বলতে বলতে কয়েক-পা পিছিয়ে যান স্বামীজী এবং পরমুহূর্তেই সুপরিকল্পিত একলাফে অদৃশ্য হন, বোধকরি যোগবলেই।

টুসির দাদু শুধু বলেন—"ছ্যাঃ!"

ঐ অব্যয়-শব্দে টুসির কি প্রণিধান হয়, কে জানে; সে লজ্জায় ঘাট হেঁট করে থাকে।

ওর বিষণ্ণ মুখ দেখে মায়া হয় দাদুর।—"যাক্, তাতে আর কি হয়েছে? তুই তো ভালোই চেয়েছিলি—যাকগে, ভালোই হয়েছে। পরশু আছে শিবরাত্রি। ছোটবেলা থেকেই ভেবে আসছি যে, শিবরাত্রি করবো; কিন্তু করা আর হয় না! হয় খেয়ে ফেলি, নয় ঘুমিয়ে পড়ি। এবার তো আর ঘুমোনোর ভয় নেই, কেবল

খাওয়াটা বাদ দিতে পারলেই হয়। তাহলেই হোলো। পুণ্যটা করে ফেলা যাক, এই ফাঁকে—এই ফাঁকতালে। কি বলিস্?"

টুসি এতক্ষণে খুশী হয়—"আমিও করবো তাহলে দাদু!"

তখন দু'জনে মিলে প্ল্যান আটেন—না-খাওয়ার, না-ঘুমোনোর প্ল্যান। দীর্ঘ এক ফিরিস্তি হয়—কখন কি কি না-করতে হবে, তার। টুসি কি না খেয়ে থাকতে পারবে, বিশেষ করে না ঘুমিয়ে? যা ঘুম পায় ওর। আর যেমন বিটকেল খিদে। দিনরাত খালি খাই-খাই। আর—সারাদিন না হয় টেনিস খেলেই গেল, কিন্তু রাত্রে? রাত্রে টেনিস-খ্যালা তো সম্ভব নয়, আর রাত্রে তো ঘুম পাবেই টুসির। এ বিষয়ে টুসির দাদুর তো বিশ্বাস দৃঢ়ই; টুসির নিজেরও যে একেবারে সন্দেহ নেই, তা নয়।

টুসি প্রস্তাব করে—সারারাত সিনেমা দেখা যাক না কেন? তাহলে কিছুতেই ওর পাত্তা পাবে না, শিবের দিব্যি গেলে সে বলতে পারে। কত ভালো-ভালো বাংলা বই আর বিলিতি সিরীয়াল—হোল্‌নাইট শো আছে সব হাউসেই।

বায়স্কোপে দাদুকে রাজি করতে বেশি বেগ পায় না সে। আর তখন থেকেই লাফানি শুরু হয়ে যায় তার।

শিবরাত্রির সকাল থেকেই উপবাস শুরু হয় টুসির। প্রথমে রাস্তায় বেরিয়েই এক বন্ধুর আমন্ত্রণে রেস্তোরাঁয় বসে অন্যমনস্কতার বশে এককাপ চা আর একখানা অমলেট; তারপরে ঘণ্টা দুয়েক পরে আর এক বন্ধুর পাল্লায় আবার অন্যমনস্কতায় চিনেবাদাম আর ডালমুটের সদ্ব্যবহার; তারপরে আরেকজনার খর্পরে পড়ে আবার শোনপাপড়ি আর চন্দ্রপুলি, সেও অবিশ্যি ভুলক্রমেই; তারপরে বিকেলে যোগেশদার আহ্বানে অনিচ্ছাসত্ত্বেই একপ্লেট মটনকারি আর খানকয়েক টোষ্ট, তারপর সন্ধ্যের মুখে ওদের ক্লাসের সেকেণ্ড বয় সমীরের বাড়ি হানা দিয়ে এবং সে না সাধতেই—তাকে সতর্কতার অবকাশ না দিয়েই তার পাত থেকে পাঁচখানা পরোটা আর গোটা-দশেক আলুর দম—এইভাবে সারাদিন দারুণ

উপবাস চালিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত টুসি রাত নটার সময় দাদুর সঙ্গে যায় এক নামজাদা সিনেমায়।

বেশ দেখছে সিরীয়াল, কেটেও গেছে খানিকক্ষণ; রোমাঞ্চ, রুদ্ধনিশ্বাস এবং হৃৎকম্পও হয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, চোখের পাতা বুজবার অবকাশ নেই—এমন সময়ে টুসির কানে বিচ্ছিরি এক সোরগোল আসতে থাকে –চাপা একটা গোলমাল– খুব কাছাকাছি থেকেই। হাঁপ ছাড়ার অবকাশ নেই, তাহলেও ঘাড় ফিরিয়ে গ্যাখে টুসি, একফাঁকে দেখে নেয়—ঘুমোচ্ছেন ওর দাদু অকাতরেই, আর—

—আর দীর্ঘ তিনমাস পরে শিবরাত্রি জাগতে বসে আবার ডাকছে দাদুর নাক।

"খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার! ভারি বিচ্ছিরি!—"

হোটেলওয়ালা তিক্ত কণ্ঠে অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

হোটেলের চাকর মাছ কুটছিল, বঁটি থেকে চোখ সরিয়ে মনিবের দিকে তাকিয়ে থাকল খানিক।

"আমাদের ছিরিপদর কথা বলছেন?" জানতে চাইল সে তারপর।

"না না! ছিরিপদ নয়। আমাদের নতুন খদ্দের দুজন, কলকেতার খদ্দের, দেখেচিস্ তো?"

"দাদু আর নাতি। পরশুদিন হোলো যাঁরা এসেচেন তো?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তাদের কথাই বলছি! কি বিচ্ছিরি বল দেখি?" হোটেলওয়ালার মুখভঙ্গি বিরক্তিম হয়ে ওঠে:

"নাতিদাদুতে মিলে দিনরাত কেবল ঘ্যানোর আর ঘ্যানোর! নাতির সঙ্গে আবার তর্কাতর্কি কিরে বাপু? নাতিকে ধরে ঠাঙাবি, একটু মুখজোর হলেই ঠ্যাঙাবি; কথার উপর কথা কইতে এলেই ধরে পিটুনি দিবি এইতো জানি! তা না—" হোটেলওয়ালা, ছেলেদের সতর্ক হতে দেবার আগেই প্রহার দেবার পক্ষপাতী, তার স্পষ্ট ভাষায় সেটা বিশদরূপে ব্যক্ত হয়?

"কলিকালের ছেলে কর্তা। সেটা হুঁশ রাখবেন ?"

"কলিকালের ছেলে তো কি হয়েছে ? তা বলে দাদুর গায়ে হাত তুলবে নাকি ? নাতির ভয়ে ভয়ে দাদুকে জুজু হয়ে থাকতে হবে নাকি ? তাহলেই হয়েছে ! সুখের চোদ্দ পোয়া ! কই আসুক দেখি আমার নাতি ? কদ্দুর তার আস্পর্ধা ? আসুক না লাগতে আমার সঙ্গে ? আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে তো ? এক ঘুঁষিতে তার তিন পাটি দাঁত উড়িয়ে দেব না ! আসুক না ব্যাটা !" বলতে বলতে হোটেলওয়ালা ঘুঁষি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তক্ষুনি।

হোটেলের চাকর একটু ইতস্তত: করে এবং একটু পিছিয়ে বসে, কথাটা বলবে কি না বলবে খানিক বিবেচনা করল। উদ্যত ঘুষিটার সম্বন্ধেও মনের মধ্যে কিছুক্ষণ আন্দোলন না চালিয়ে সে পারল না। অবশেষে সত্যের খাতিরে অনেক সমীহ করে জানাতে বাধ্য হোলো সে :

"আপনার নাতি যে মোটে তিন বছরের কর্তা ! আর তিন পাটি তার কি ভাঙবেন, একপাটি দাঁতই ভালো মতন তার ওঠেনি এখনো।"

"না উঠেছে তো বয়েই গেছে ! যার উঠেছে সেই আসুক না ! তাকেই আমি বড়ো ভয় খাচ্ছি নাকি ?"

এই বলে হোটেলওয়ালা, বুক ফুলিয়ে, তাঁর বলিষ্ঠতর বিপুল ভুঁড়িকে টেক্কা মেরে যদ্দুর বুক ফোলানো সম্ভব তদ্দুর ফুলিয়ে এক খানা বিমানধ্বংসী কামানের মতই নিজেকে খাড়া করলেন এবার।

বেচারা চাকর এরপর আর বেশী উচ্চবাচ্য করে না—করা সমীচীন মনে করে না। নীরবে মৎস কর্তনে মনোযোগ দেয়।

"ছোড়াটার বয়স কতো ? কতো তোর অন্দাজ ?"

মনিবের প্রশ্নে আবার সে বঁটি থেকে চোখ তোলে : "বল্লাম তো তিন বছর ! তার বেশী আর কতো হবে ? গিন্নিমাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয় ?"

"ধুত্তোর গিন্নিমা! আমি কি আমার নাতির কথা জিজ্ঞেস করেছি? তোর ঐ কলিকালের ছেলেটার বয়সের কথাই তো জানতে চেয়েছি আমি।"

"আমার? আমার ছেলের কথা কইছেন? আমার ত কোনো ছেলেপুলে নেই কর্তা! ভগবান কি আর মুখ তুলে চাইলেন অভাগার পানে! বিয়ে করবারই তাল পেলাম না—!" এই বলে হোটেলের চাকর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"হাঁদারাম বোদাই চণ্ডী! আস্ত গোরু কোথাকার!—তোর ছেলের কথা ভেবেই তো খেয়ে দেয়ে আমার ঘুম নেই। পরের ছেলের ভাবনা ভাববার আমার সময় আছে কিনা! একটা কথাও যদি তোর মগজের মধ্যে সেঁধয়! দুর দুর! তোকে এবার দূর করেই দেব।"

এ হেন দুর্দমনীয় বিরক্তির মুহূর্তেই, হাফ-প্যান্টের অন্তর্গত একটি ছেলে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

"নাঃ, দাদুর সঙ্গে আর পারা গেল না। একটা কথাও যদি দাদুর মাথার মধ্যে ঢোকানো যায়!"

এই ধরনের সমুচ্চ স্বগতোক্তি শোনা গেল ছেলেটির মুখে:

"হাতুড়ি পিটে ঢোকানোও দুঃসাধ্য!—"

এর পরে—এতখানি বাগাড়ম্বর শোনার পরেও বিরক্তি দমিয়ে রাখা হোটেলওলার অসহ্য হয়ে পড়ে, তিনি বলে উঠেন: "তোমার বয়েস কতো হে ছোকরা?"

ছেলেটি একটু চমকেই যায়। "আমার? আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?"

"তোমাকে না ত আবার কাকে?"

"আমার বয়েস?" বিস্ময় এবার ওর চমককেও ছাড়িয়ে ওঠে।

"তোমার না ত কি আমার? আমার বয়স কতো আমার জানা আছে। ভালো মতই জানা আছে। না হয়, গিন্নিকে জিজ্ঞেস

করলেই জেনে নিতে পারব'খন! আমার বয়সের কথা তোমাকে কেন জিজ্ঞেস্ করতে যাবে, শুনি?"

"ও! আমার বয়েস? তাও জানা এমন শক্ত কি?—"ছেলেটি ঘাড় চুলকে কপাল কুঁচকে জবাব দিল।

"আপনার বয়সের সঙ্গে আপনার চাকরের বয়স যোগ করুন, তারপর মাছের টুকরোগুলো দিয়ে ভাগ দিন ক'টুকরো মাছ হয়েছে?—দিয়ে দেখুন, তাহলেই আমার বয়স পাবেন।"

"মাছের টুকরো দিয়ে ভাগ দেবো কেন?" হোটেলওয়ালা অবাক হয়ে যান: "মাছের টুকরো দিয়ে ভাগ দেবো কেন?"

"বঁটি দিয়েও ভাগ করতে পারেন। আপনাদের দুজনকে বঁটি দিয়েও ভাগ করা যায়। তাহলে কিন্তু আপনাদের বয়সের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।"

হোটেলওয়ালার মুখে কথা সরে না। চাকরটাও, রুই মাছটার মতোই, হাঁ করে বসে থাকে।

"ভাবছিলাম এক কাপ চা খাবো। কিন্তু আপনার হোটেলের চেয়ে সামনের রেস্তোরাঁটাই দেখছি বেশী নিরাপদ। সেখানে বয়সের প্রশ্ন নেই। সেখানেই গিয়ে খাই গে।"

ছেলেটি উধাও হবার এক মিনিটের মধ্যেই দাদুটি নেমে এলেন: "কোথায় গেল আমার নাতি?"

হোটেলের কর্তা ও কর্ম উভয়বাচ্যকে সম্বোধন করেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু যুগপৎ দুজনেই বিস্ময়ে এতখানি বিমূঢ় যে, ভাববাচ্য দ্বারা যতটা জানানো যায় তার বেশী জানবার তাঁদের ক্ষমতা নেই তখন।

কারোর কোনো উচ্চবাচ্য না দেখে দাদু অগত্যা গলার স্বর একটু চড়ালেন:

"গেল কোথায় ও? দেখেন নি না কি?"

হোটেলের মালিকের জবাব এল এবার:

"দেখব না কেন? দেখে দেখেই তো দুচোখ বিষিয়ে উঠল!

কিন্তু যাই বলুন মশাই, এতটা আপনি ভালো করছেন না! এতটা আদর দিয়ে নাতিটার মাথা খাচ্ছেন আপনি। অবশ্যি বলতে পারেন, অন্য কারোর নাতি তো না, তাদের কেন এত মাথাব্যথা, আপনার নিজের নাতির মাথাই নিজে খাচ্ছেন, একথা বলতে পারেন বটে—"

হোটেলের চাকর আর একটা উপমা যোগায় ; এই অনুযোগে যোগ করব র সুযোগ পায়।

"নিজের পাঁঠা নিজের ন্যাজের দিকে কাট্ছেন, বলতে পারেন বাবু!" এই ফাঁকে সে যোগান্ দেয়।

কাটাকুটির ব্যাপারে রামচরণ একেবারে অদ্বিতীয়। সে বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্ত যোগাতে হলে, তার সমকক্ষ তিন তল্লাটে আর কেউ নেই, এমন কি ছিরিপদও না। একপো মাছকে একশো টুকরো সে করতে পারে।

"এসব কথা কেন?" জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক আকাশ থেকেই পড়েন, অথবা আকাশ থেকেই কোন কিছু বোমা টোমা গোছের —তাঁর ঘাড়ে এসে আচমকা পড়ে যেন—"এত কথা কেন? আমি আপনাদের কী জিজ্ঞেস করেছি?"

"যা জিজ্ঞেস্ করেছেন, দিব্যকাণেই শোনা গেছে। ছেলেটা গেল কোথায়? কোথায় আর যাবে, ধারে কাছেই আছে, ও কি আর যাবার ছেলে? গেলে তো বুঝতাম আপনার ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। বাপস্—"

"গন্ধমাদন নেমে গেল আপনার ঘাড় থেকে, হাঁ কর্তা!" রামচরণ এবার রামায়ণ থেকে উপমা এনে ফ্যালে। মোক্ষম এক উপমা এক হ্যাঁচকায় টেনে আনে।

ভদ্রলোক এবার একটু হকচকিয়ে যান: "এসব কেন বলছেন? ও কি কিছু ভেঙ্গেছে চুরেছে—কোনো ক্ষতি করেছে আপনাদের! বলুন তার দাম দিয়ে দিচ্ছি—"

বলতে বলতে পকেট থেকে তিনি মনিব্যাগ্ বার করেন।

"ক্ষতি ও আর কার কী করবে, নিজেরই করছে। নিজেরই পায়ে কুড়োল মারছে ও। আপনি আবার তাই বলে ওর আরো বেশী ক্ষতি করবেন না! দাতুর পক্ষে নাতির ন্যাওটা হওয়া কী ভালো মশাই? ভালো কি? সেটা ভারী খারাপ দেখায়। ছেলেকে বকবেন, ধমকাবেন, শাসন করবেন—"

"ধরে ধরে পিটবেন।" রামচরণ বলে।

উঁহু, প্রথমে পিটুনি নয়। প্রথমে তর্জন—তাতে না হলে, গর্জন! তাতেও না শুধোয় যদি, তখন—তখন আর কি তখন উর্পর্যুপরি—।"

"তাহলেই হয়েছে! নাতি আমার তক্ষুনি বাড়ি থেকে চলে গেছে তাহলে! চলে গেছলও তো একবার! আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে, কত করে তো—"

'পালিয়ে গেলে তো বাঁচা যায়! অমন অবাধ্য ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিতে হয়। ধরে বেঁধে—মেরে ধরে—তাড়াতে হয়। দাতুর কথার উপর কথা বলে, দাতুর সঙ্গে তর্কা-তর্কি চালায়, দাতুর মুখের উপর চোপ্‌রা—অমন ছেলেকে আবার বাড়িতে ঠাঁই দেয় মানুষ? আমি তো ওর দাতু নই, আমাকেই কেমন কথা বলে গেল ছেলেটা!—"

"কি! কোনো গালমন্দ করেছে আপনাকে?

"না, গালমন্দ নয়। শক্ত একটা আঁক, কিম্বা হয়ত একটা ধাঁধাই হবে, গছিয়ে দিয়ে গেছে আমায়। আপনি হুদিনের খদ্দের হলে এত কথা বলতুম না আপনাকে। আপনার হিতাহিত নিয়ে, ইষ্টানিষ্ট নিয়ে, এত মাথা ঘামাতে যেতুম না। আপনি থাকেন কলকাতায়, আর আমার হোটেল কদমতলায়—দশ বছরেও একদিন এধারে আপনার আসা হবে কি না সন্দেহ! লেনদেনের সম্পর্ক আপনার সঙ্গে এমন কি আমার? বলুন! আর আপনার সঙ্গে একদিনের আলাপ তো নয়! বহুদিনের বন্ধুত্ব বলতে গেলে —সেই খাতিরেই এত কথা বলা। সেই মনে পড়ে আপনার,

একই বছরে আমরা একই সেণ্টার থেকে এণ্ট্রান্স দিলাম? আপনি ফেল্ গেলেন, আর আমি, খুবই দুঃখের বিষয়, কিছুতেই ফেল যেতে পারলুম না! মনে পড়ে?"

লজ্জিত ভাবে দাদু ঘাড় নাড়েন: "তা এক আধটু পড়ে বইকি!"

"সেই পাশাপাশি বসে পরস্পরের খাতা থেকে টুকলিফাই করেছি? একদিনের আলাপ তো নয় আমাদের! যদিও সেই দেখা আর এই দেখা—"

"আমার ভারী আশ্চর্য লাগে বটকেষ্টবাবু!" দাদু বহু দিনের হারানো একটা প্রশ্ন খুঁজে পান হঠাৎ:

"আমার খাতা থেকে টুকে আপনি দিব্যি কেটে বেরিয়ে গেলেন, অথচ, আপনার খাতাটা টুকে আমি কিনা লট্‌কে গেলাম! আশ্চর্য!"

"ওই রকমই হয়! এই জন্যেই তো টোকাটুকি নিষেধ। টুকতে নেই তো ওই জন্যেই! আমিও পাস করতে পারব এরকম আমার আশা ছিল না, অথচ করে গেলাম, প্রথম বিভাগেই গড়িয়ে গেলাম তো! সেও কম আশ্চর্য না ঘনশ্যামবাবু!"

"লটারী! লটারী!" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে দাদুর খেদোক্তি ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আরেকটি—তেমন খুব অতীতের নয়—নিতান্তই বর্তমান আরেক দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়: "ছেলেটা গেল কোথায় বলুন তো?"

"কোথায় আবার যাবে? কাছেই কোথায় চা খেতে গেছে। আধমাইলের মধ্যেই রয়েছে। পাশের রেস্তোরাঁটায় গিয়ে দেখুন না!" বটকেষ্টবাবু যেন চিরতা পানে বমি করে ফ্যালেন।

আগের ঘটনারও দুদিন আগে।

ঘনশ্যামবাবু, খবরের কাগজ সামনে রেখে, মনে মনে সিগফ্রিড আর ম্যাজিনো লাইনের মাঝামাঝি পায়চারি করছেন; যুদ্ধটা কেন এখনো ভালো মতো গড়াচ্ছে না, তার জন্য অন্তঃকরণে

অহেতুক একটা আক্ষেপ বোধ করছেন, এমন সময়ে টুসি একটা বোমারু প্লেনের মতো, সেই সবের সেই সমস্ত খবরাখবরের মাঝখান দিয়ে—সিগফ্রিড ম্যাজিনো ইত্যাদি ভেদ করে এসে হাজির।

এবং এসে অচিরেই একটি অগ্ন্যুৎপাদক বোমা সে পরিত্যাগ করে বসেছে। "দাদু! আজ বিকেলে আমি একটা পিকনিকে যাচ্ছি।"

"পিকনিকে! পিকনিকে কেন?

দেখতে দেখতে ঘনশ্যামবাবু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছেন: "তোর কি এ একটা ব্যায়রাম দাঁড়ালো নাকি রে টুসি? কেবল পিকনিক আর পিকনিক! দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—একটা হপ্তাও বাদ যায় না—খালি শুধু পিকনিকের কথা! এ কি? অ্যাঁ?"

"না দাদু! তুমি আমাকে একবারও কোনো পিকনিকে যেতে দাওনি। সেই ছোটো বেলার থেকে,—সত্যি! কিন্তু এখন তো আমি বড় হয়েছি, কতো বড় হয়েছি—সেকেন ক্লাসে পড়ি এখন। এখনো আমি পিকনিকে যেতে পাবো না?"

"না, কিছুতেই না! ছেলে বড় হয়েছেন! ভারী বড় হয়েছেন আমার! বড় হয়েছেন না হাতী!—"

এই বলে ঘনশ্যামবাবু পুনরায় প্যারিসের দিকে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করেন। খবরের কাগজের যে পাতাটায় ইউরোপের বিরাট এক ম্যাপ ছাপা হয়েছিল, তাকেই ধরে চিৎ করে ফ্যালেন। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটাকে চিৎপাৎ করে নিজের করতলগত করে এনে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন আবার।

টুসি বলতে থাকে: "না দাদু, আমি যাবো।"

ঘনশ্যামবাবুর কান নেই।

"না দাদু, এবার আমাকে যেতে দিতে হবে। দিতেই হবে।"

"না দাদু—না দাদু—না দাদু!"

টুসি বলতে থাকে কেবল।

আর ঘনশ্যামবাবুর আঙুল ঘোরাফেরা করে; ম্যাপের এ কোণ থেকে ও কোণে, এখান থেকে সেখানে, এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে। এবং তাঁর চোখ সঙ্গে সঙ্গে চলে। আঙুলের সাথে সাথে চলে—দেবী বিন্দুবাসিনীর আচল ধরে ধরে।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর আঙুল থামে এবং তাঁর চোখ প্যারিস এবং ব্রাসেলস্, বার্লিন এবং লণ্ডন, ডাবলিন এবং ডোভার থেকে সরে আসে। সরে ভারতবর্ষে চলে আসে, সটান তাঁর নিজের বাড়িতে—একেবারে টুসির মুখের উপর এসে দাঁড়ায়।

"দেখেছিস্? কী আশ্চর্য দেখেছিস?—" তাঁর বিস্ময়াহত কণ্ঠ শোনা যায়ঃ "এই সব ছোট ছোট ফুটকি দেখছিস—এগুলো ফুটকি নয়। বড় বড় সহর সব। আকাশের ছোট্ট ছোট্ট তারাগুলো যেমন ধেড়ে ধেড়ে এক একটা সূর্য!—বলে না এই রকম? প্রায় সেই রকমই আর কি! আর এই যে এখানে ঘিঞ্জিগোছের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এইটেই হোলোগে তোর সেই ম্যাগিনট্ লাইন! ম্যাগিনট্! বাবা! কী কটমটে বিচ্ছিরি নাম!"

"ম্যাগিনট্ নয় দাদু, ম্যাজিনো···আজ বিকেলে আমি যাচ্ছি কিন্তু দাদু?" টুসি বলে।

তথাপি বলে।

টুসিকে সহজে ভোলানো যায় না। পিকনিক ছেড়ে এমন কি প্যারিসের দিকেও এক পাও বাড়াতে সে রাজী নয়।

"ছিঃ পিকনিকে গেলে শরীর খারাপ হয়।—" দাদু এবার অন্য সুর ধরেন। তার চেয়ে চল্ আমরা বাইশকোপে যাই আজ। কেমন? সেই ভালো নাকি?"

বাইশকোপের দিকেও টুসির বাই এবং দাদুর কোপ কিছুমাত্র কম নয়—কিন্তু তবু দাদু এক্ষেত্রে; নিজের দিকটা দাবিয়ে পিকনিকের বদলে টুসির আর এক দাবী মেনে নিতে নারাজ হন না।

"না দাদু! আমায় পিকনিকে যেতে দাও। কেবল এই বারটি!

একবারটি কেবল। তোমার পায়ে পড়ি দাদু। রোজ রোজ কেবল স্কুল আর বাড়ি, রোজ রোজ কি ভ্যালো লাগে? মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে আউটিং-এ না গেলে হয়?"

নাতিকে বাড়িছাড়া করবার ভারী বিপক্ষে ঘনশ্যাম। কবে একবার গভীর রাত্রে কলিকের বেদনা ওঠায় নাতিকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছাতেই পাঠিয়েছিলেন; তারপর সেই নাতিকে আবার বাড়ি ফিরিয়ে আনতে, অসুস্থ শরীরেই, রাতারাতি আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে, কত কি কাণ্ড করতে হয়েছিল। কলিকের ব্যথা মাথায় উঠে গেছল তাঁর। নাতিকে দিয়ে ডাক্তার ডাকাবার সুযোগে আয়েস করে একটু যে কলিকের বিলাসিতা করে নেবেন সে সুখও বিধাতা তাঁর কপালে লেখেননি। সেই থেকে, এহেন বারমুখো ছেলেকে বাড়ির বাইরে কোথাও পাঠাতে ঘনশ্যামের ঘোরতর আপত্তি। সে ছেলে বাড়ির বাহিরে পা বাড়িয়েই দাদুকেই ভুলে যায়। দাদুর কলিক্‌কেও গুলে খায় (ডাক্তারকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই!)—তারপর আবার আরাম করে পার্কের গরাদের ফাঁকে গিয়ে আটকে থাকে; আর সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে ঘুম মারতে পারে সেই ছেলেকে একটুক্ষণের জন্যেও কোথাও পাঠিয়ে কি স্বস্তি আছে?

"আচ্ছা, আজ তো ফুটবল খেলাও রয়েছে—তা দেখতে গেলেও তো হয়? কার সঙ্গে কার ম্যাচ আছে জানিস্?"

"এবারও যদি পিকনিকে না যাই তাহলে বন্ধুরা কি ভাববে বলোত?' টুসির মুখে সেই এক কথা।

"বন্ধু!" টুসির দাদু এবার আকাশ থেকে পড়েন: "তোর—তোর আবার বন্ধু আছে নাকি?"

"বাঃ, আছেই তো! অনেক আছে!"

"অ্যা? কী সর্বনাশ! এইটুকু ছেলের আবার বন্ধু কি? বন্ধু থাকবে আমাদের, আমাদের-বড়দের সব বন্ধু থাকে, এই তো জানি। যেমন হতভাগা পাঁচকড়েটা আমার বন্ধু ছিল! ছোট-

বেলার থেকেই ছিল। একরকমের বাল্যবন্ধুই বলা যায়। কিন্তু তুই এক ফোঁটা ছেলে—তোর আবার বন্ধু কী ?"

"বা, ক্লাসের ছেলেরা সব বন্ধু নয় বুঝি ? তাহলে ক্লাসফ্রেণ্ডরা তারা কী শুনি তাহলে ? ক্লাসফ্রেণ্ড তাদের বলে কেন তবে ?

"ক্লাসফ্রেণ্ড ? এক নম্বরের ক্লাস ফো সব। এ ক্লাস অফ এনিমি ! ক্লাসফ্রেণ্ড আর বলতে হয় না ওদের ! ওদের মতন শত্রু আবার আছে নাকি ? ভুল পড়া বাতলাতে ওরা অদ্বিতীয় ! ভুল উত্তর যুগিয়ে মাষ্টারের মার খাওয়াতে ওদের জোড়া আর কেউ নেই। বেঞ্চির উপর তোমার দাঁড়াবার সহায়তা করতে সব সময়েই ওরা প্রস্তুত ; ফাঁকতালে চাঁটাবার সুযোগ যদি পেয়েছে তো কথাই নেই—কসে তোমায় চাঁটিয়ে দেবে ! ওদের তুই বন্ধু বলিস ? পরীক্ষার আগে কেউ ওরা কোশ্চেন বলে দ্যায় ? পরীক্ষার সময় একটুখানি খাতা দেখিয়ে সাহায্য করে কেউ ? তবে····তবে ?

তবে ? এসব মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর কী ? টুসি নিজেও কিছু কম ভুক্তভোগী নয় তার - দাতুর অভিজ্ঞতা যে তাকে পেতে হয় নি একথা বলা চলে না। তবে—তা ঠিক !—কিন্তু তবু—! ওদের বাদ দিলে—ওই সব অপদার্থদের বিয়োগ করলে, টুসির জীবনে, যৎসামান্য জীবনে, তাহলে আর থাকে কী ?

"তা হোক্ গে দাতু, তাহলেও পিকনিকটা কি রকম ফুর্তি, একবার ভাবো দেখি !"

ভাববার চেষ্টা না করেই দাতুর ভাবনা বেড়ে যায়—হ্যাঁ, ফুর্তি তো ভারী ! যত সব ধাড়ী ধাড়ী বখা ছেলে সব। তারাও সব যাবে তো ? তাদের সঙ্গে তুই পারবি ? পেরে উঠবি ? বাচ্চা পেয়ে তোকে ধরে গুঁতিয়ে দেবে তারা। তখন ?"

গুঁতিয়ে দিলেই হোলো আর কি ! আমার গায়ে জোর নেই বুঝি ? অমন অনেক গুণ্ডা দেখেছি। আমার সঙ্গে আর লাগতে হয় না !

নাতির আশ্বাসে দাতু ভরসা পান কিনা বলা যায় না, তবে তাঁর সুর একটু নরম হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন :

"কজন যাবে পিকনিকে?"

"তা জন ত্রিশেক!"

"ত্রিশ জন। ও বাবা! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। সুগ্রীবের সঙ্গে গোটা কিষ্কিন্ধ্যা? তাহলেই হয়েছে। তার ভেতরে তোর চেয়ে বড় বড় ছেলেরাও আছে?"

"আছেই তো!"

"তারাও তোর বন্ধু?"

"নিশ্চয়!"

"আর তোর চেয়ে বয়সে ছোট, তারাও রয়েছে?"

"অনেক।"

"তারাও তোর বন্ধু নাকি?"

"ছোটরা? ছোটরা আবার কী বন্ধু হবে? তাদের আমি টুসিদা। তারা আমাকে আপনি বলে কথা বলে।" আত্মমর্যাদা বোধে অকস্মাৎ টুসি নিজেকে অতি বৃহদাকার করে ছাখে। "আমি তাদের লীডার।"

"সবই খারাপ খুবই খারাপ সব! রীতিমতই খারাপ! বড় ছেলেদের বন্ধু হওয়া, ছোটছেলেদের মুরুব্বি হওয়া, কিছুই ভালো নয়! এই সব মিলিয়েই—যাকে বলে সর্বনাশ! এরই ফলে ছেলেদের আখের নষ্ট হয়! না, এসব আমার পছন্দ নয়—একেবারেই নাপছন্দ! দস্তুর মতই এসব খারাপ।"

"পৃথিবীর সবই তো খারাপ দাদু! ভালো আর কোথায়? বিরক্ত হয়ে টুসি দার্শনিকের মতন কথা বলে।

"তারপর আজকের কাগজে যা ভয়ানক একটা খবর বেরিয়েছে তারপরে কি কাউকে পিকনিকে ছেড়ে দিতে সাহস হয়? আবার —আবার না ছাড়লেও তো বিপদ! কোন্‌দিকে যে যাই!" হতাশার ব্যাকুল অভিব্যক্তি দাদুর।

"কী কী খবর?" টুসির নিরুৎসুক আগ্রহ।

"পড়েই ছাখো না!" ওই-তো-পড়ে আছে! দাদু আঙুল দিয়ে কাগজের একটা ভগ্নাংশ দেখিয়ে ছান।

সি পড়ে ছাখেঃ ছোটবড় অক্ষরে লেখা এক দুঃসংবাদের রোমাঞ্চক কাহিনী ঃ—

ভারী বিপর্যয়কর ব্যাপার !
পিকনিক কাণ্ডের শোচনীয় পরিসমাপ্তি !!!

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে, গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া একটি ছোট ছেলে কাঁদিতেছিল ! তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বালক' তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? এমন কাঁদিতেছ কেন ?'

তাহাতে সেই ক্রন্দন পরায়ণ বালক উত্তর দিল, 'বাবা আমাকে পিকনিকে যাইতে দেয় নাই, সেই কারণেই আমি কাঁদিতেছি।'

তখন সেই অপরিচিত ভদ্রলোক বলিলেন, 'তাহার জন্য কি হইয়াছে ? তাহার জন্য কি কাঁদে ? চলো কোথায় যাইবে ? আমি তোমাকে পিকনিকে লইয়া যাইতেছি।'

অতঃপর সেই রোরুদ্যমান বালকটি সহাস্যবদনে সেই যুবকের সহিত পিকনিক করিতে চলিয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠে, বালিগঞ্জ রেলোয়ে ষ্টেশন হইতে সন্নিকটে, একটি পোড়া দোতলা বাড়িতে দুজনে মিলিয়া পিকনিক করিতে যাইতেছিল— কিন্তু পিকনিক একটু অগ্রসর হইতেই, পিকনিকের গন্ধে (তাহারা খিচুড়ি চাপাইয়াছিল) কোথা হইতে একপাল ইঁদুর আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। ক্রমশঃ সেই ইঁদুরদের সহিত চামচিকারা আসিয়া যোগ ছায়— আর্সোলারাও আকাশ হইতে পড়িয়া ফরফর করিয়া উড়িতে থাকে।

খিচুড়ি বাড়িবার পর উপদ্রবও অতিশয় বাড়ে। দুজনের জন্য খিচুড়ি—কিন্তু জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে অন্যূন দুচার হাজার আগন্তুক—এতগুলি অনিমন্ত্রিত অযাচিত অতিথি ! এতাদৃশ বাড়া-

বাড়ি যুবকটির পক্ষে অসহ্য হওয়ায়—পিকনিকের স্থল হইতে, খিচুড়ির পাতা ফেলিয়া যে পলায়ন করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু পা বাড়াইতেই, দরজার গোড়ায়, সিঁড়ির মুখে, বাড়ির সমুখে লীলায়িত লেলিহান নানা জাতীয়, বিজাতীয়, ক্ষিপ্ত প্রায় কুকুরদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পায়।

এই অবস্থায়, পলাইবার পথ না পাইয়া উপায়ন্তর না দৃষ্টে, যুবকটি জানালা দিয়ে অগত্যা শর্টকাট করিবার চেষ্টা ছ্যাখে—তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া বেচারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পুলিস এই পিকনিকের অপর আসামী, সেই বালকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সেই যুবকটিকে একা পাইয়া, অসহায় পাইয়া, ভুলাইয়া ফুসলাইয়া পিকনিক করিতে এক পোড়ো বাড়িতে লইয়া যায়, এবং সেখানে ইঁদুর, আর্সোলা ও কুকুরদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া (ইঁদুর, কুকুর ও আর্সোলাদের কেহ কেহ গ্রেপ্তার হইয়াছে—কিন্তু চামচিকাদের ধরিতে পারা যায় নাই।) ঐ হতভাগ্য যুবকের উপর লেলাইয়া দেয়। এবং তাহার পর সেই যুবককে সকলে মিলিয়া জানালার কার্নিসে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া ধাক্কা দিয়া নিচে ফেলিয়া হত্যা করে।

বালকটির বয়স আট বৎসর, যুবকটির আটাশ। উভয়ের বয়স বিবেচনা করিলে ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ না। কেননা, ছোট ছোট ছেলেপিলেরা ভয়ঙ্কর রকম মারাত্মক হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সংবাদদাতা, আরেকটি নাতিবৃহৎ বালকের ভীতিপ্রদ কাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন—সেই বালকটির বয়স আড়াই বৎসরের বেশী ছিল না। এবং তাহার কাজের মধ্যে ছিল, রাত্রে কাঁদা। আড়াই বৎসর একাদিক্রমে কান্না শুনিবার পর, একদিন রাত্রে, অত্যন্ত অসহ্য বোধে, সেই বালকের বাড়িতে যে কয়জন নাবালক পুরুষ ছিল তাহারা সকলে একজোটে সেই বাড়ির দোতালা, তেতালা

ও চারতালার বিভিন্ন জানালা হইতে লাফ মারিয়া ফুটপাথে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। করিতে বাধ্য হয়।

হত্যাপরাধে সেই আড়াই বর্ষীয় বালকের ফাঁসী হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু এই বালকটি, সম্প্রতি, যুবক খুনের মামলায় আসামী হইয়া দায়রায় সোপার্দ হইয়াছে।

আমরা এই মামলার সুবিচারের—নিতান্ত পক্ষে ফাঁসী না হইলেও—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের প্রত্যাশা করি।

খবরটা আগাগোড়া পড়ে টুসি গুম হয়ে থাকে। পিকনিকের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বোধ হয়—আগের এবং পরের কথা ভাবে। চামচিকে এবং আর্সোলাদের কথা মনে মনে আলোচনা করে হয়ত। দাদু এই রকমই আন্দাজ করেন—করে উৎফুল্ল হন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টুসি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ঃ

"তাহলে কি তুমি বলতে চাও আমি পিকনিকে যাব না ?"

"একা একা হলেও কথা ছিল না, আমি তেমন আপত্তি করতাম না। কিন্তু—"

"বাঃ, একা একা আবার পিকনিক হয় নাকি ? তাতে আর মজা কি ?"

"তারচেয়ে এক কাজ করা যাক না। তুই আমি দুজনে বাড়িতে বসে পিকনিক করলে কেমন হয় ?"

"বাড়িতে বসে পিকনিক ?"

"তা হয় না ? পিকনিক মানে কোলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে খাওয়া দাওয়া—এইতো ? নাকি ? তা তোতে আর আমাতে দুজনে কোথাও বেড়াতে গেলেই তো হয় !"

এ প্রস্তাবটা টুসির তেমন মন্দ ঠ্যাকে না। টুসি উৎসাহিত হয়।

"বেশ তাই চলো দাদু ! অনেক দূরে কোথাও ! বোম্বাই কি বারমা ? কিম্বা আগ্রাতেই চলে যাই সটান। সেখানে আবার তাজমহলও আছে।"

"দূর দূর ! অত দূরে যায় ? অতদূরে গেলে চলে ? এই কাছা-

কাছি কোথাও—ধর, বেলগেছে কি বেলেঘাটা! আচ্ছা, উলুবেড়ে থেকে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? কিম্বা ধর,—লেকের চার পাশে এক চক্কর মেরে আসি যদি? পিকনিক করা বইত নয়—বেড়ানো নিয়ে হোলো কথা। বেড়াও আর মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁ ছাখো আর চাখো! এই তো?"

"বা রে! সেই কলকাতাতেই যদি থাকলুম, তাহলে আর বার হলুম কি?"

তাহলে চল কদমতলায় যাই। কদমতলা বেশী দূরেও নয়। সেখানে আমার এক আলাপী ভদ্রলোক হোটেল ফেঁদে বসেছেন, সেইখেনেই গিয়ে জমানো যাক। কেমন?"

"কদমতলা! দমদম থেকে কদ্দুরে? টুসি নবোদ্যম লাভ করে।

"দমদমের একেবারে উল্টো দিকে। অবশ্যি, পৃথিবী ঘুরে যেতে গেলে, ক'মাইল, কশো মাইল, কত হাজার মাইল হবে আমি বলতে পারব না।"

"অ্যাদ্দুর?" টুসির ঠিক বিশ্বাস হয় না, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেঃ "সেখানে কি এজন্মে আর পৌঁছতে পারা যাবে?"

"নিশ্চয়! এমন বেশী দূর কি! হাওড়া কদমতলার বাসে চেপেছি কি নামিয়ে দিয়ে গেছে, কতক্ষণ আর!"

টুসি এবার ভেঙ্গে পড়েঃ "অ্যাতো কাছে!"

"সোজাসুজি গেলে কাছাকাছিই বই কি! আবার ঘুরে গেলে উলটো পথে ঘুরে গেলে অনেক অনেক দূর! পিকনিক করবার সেই তো আদর্শ স্থল নয় কি? সেখানে গেলে আরো মজা আছে, পরিশ্রম করে আমাদের রাঁধতে বাড়তেও হবে না। কেবল কষ্ট করে বসে বসে খেলেই হোলো। আলাপী সেই ভদ্রলোকের হোটেলে গিয়ে উঠব তো! শুনেছি তাঁর হোটেলে ইলিশ মাছেরই পাঁচশো সাত রকমের নাকি রান্না হয়—ইলিশের ঝাল, ঝোল, ইলিশ ভাতে, আরো সব কি কি যেন—ইলিশের কোপ্তা কাবাব—কালিয়া,

রোস্‌ট, দোপেঁয়াজী, আরো কত কি—সব তুই দেখে শুনে চেখে আসতে পারবি।”

টুসির এবার আগ্রহ দেখা যায়ঃ “ইলিশ মাছ ভাজা?”

“আরে ভাজা আছেই। তাছাড়া ইলিশ মাছের লটপটি বলেও আরো একটা কি যেন আছে আবার—আমাকে বলছিল যেন!”

টুসি এবার লটপট করতে থাকেঃ “আর ইলিশ মাছের ডিম? ডিম দাত্থ?”

“ডিম তো বটেই! ইলিশ মাছের মোরগ মোসল্লাম পর্যন্ত খাইয়ে দেবে দেখিস!”

“তবে সেখানেই চলো দাত্থ।” টুসি এবার লালায়িত হয়ে পড়ে।

কদমতলার বটকেষ্টবাবুর সঙ্গে কোলকাতার ঘনশ্যামবাবুর আলাপ ঘটেছিল একটু অদ্ভুত রকমে।

আমাদের ঘনশ্যামের এক বন্ধু ছিল তারও নাম ঘনশ্যাম মিত্র। উক্ত ঘনশ্যাম মিত্র যেবার এন্ট্রান্স দেবে, আমাদের ঘনশ্যাম তখন থার্ড ক্লাসে পড়েন। বেচারা ঘনশ্যাম পরীক্ষা-প্রার্থী, ঘনশ্যাম এন্ট্রান্সের ফি টি সব জমা দিয়ে অসুখে পড়ে গেল। স্বভাবতঃই প্রায় ছেলেরা পরীক্ষার আগে আপনা থেকেই পড়ে—বই পড়ার কথা বলছিনে, অসুখেতে পড়ে! (কি কৌশলে বলা যায় না)। তখন পূর্বোল্লিখিত ঘনশ্যাম, পরীক্ষার্থী ঘনশ্যাম আমাদের অপর ঘনশ্যামকে, অপরিক্ষার্থী ঘনশ্যামকে নিজের রুগ্ন শয্যার পাশে ডাকিয়ে এনে বল্ল:

“দ্যাখ, আমাদের নামও এক, নামের দিকেও যেমনি মিল, তেমনি আমাদের ল্যাজের দিকটাও প্রায় এক রকমের!”

তুনম্বর ঘনশ্যাম ঠিক বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে থাকে। ল্যাজের কথায়, নিজের পশ্চাদ্দেশে হঠাৎ হাত বুলিয়ে দেখে সে এক ফাঁকে।

“আমিও ঘনশ্যাম মিত্তির, তুইও ঘনশ্যাম মিত্তির!”

“মিত্তির তো কি হয়েছে?” তথাপি ঘনশ্যামের কাছে ব্যাপারটা বিশদ হয় না।

"আমার একটা উপকার করতে হবে তোকে। করতেই হবে। আমার হয়ে আমার পরীক্ষাটা তুই দিয়ে আসবি।"

"দূর! তা কি হয়?" অপরীক্ষেয় ঘনশ্যাম হেসে ওটে। বিশ্বাস করতে পারে না।

"বাঃ, কেন হবে না? তোর আর আমার নাম এক যে! তুই পাস করলে আমারই পাস কবা হবে।"

দ্বিতীয় ঘনশ্যাম এবার দুর্ভাবিত হয়ে পড়েঃ বলে, "ক্লাস প্রোমোশনেই কাবু হয়ে পড়ি; তার ধাক্কাতেই নিজেকে সামলাতে পারিনা—"

"খুব পারবি, খুব পারবি! থার্ড কেলাসের ছেলে, এণ্ট্রান্স দিতে পারবিনে?" অদ্বিতীয় ঘনশ্যাম উৎসাহ দিতে থাকেঃ "দেখিস পাস করে যাবি, আশ্চর্য রকমে পাস করে যাবি!"

"না ভাই, আমার ভয় করছে।" ঘনশ্যাম বলে।

ভয় হওয়া স্বাভাবিক। যে ফাঁড়া তিন বছর পরে আসার কথা তাকে এত কাছিয়ে আসতে দেখলে কার না ভয় হয়?

"ফেল গেলে আমিই তো যাব, তোর আর ভয়টা কি?"

"না, তা হয় না!" ঘনশ্যাম তথাপি ইতস্ততঃ করে।

এ পরীক্ষা যে তার নিজের অগ্নি-পরীক্ষা নয়, এ পরীক্ষায় পাস ফেল দুইই তার পক্ষে সমান, এ ক্ষেপে পাস ফেলের সে একেবারে অতীত, এই কথাই এক নম্বরের ঘনশ্যাম পই পই করে দুনম্বরের ঘনশ্যামকে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। বরং ভেবে দেখলে, এটা একটা পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা বইত নয়; এমন একটা পরীক্ষা যাতে ভাবনার ভ-ও নেই, কোনো ভয়ও নেই। তার উপরে, পরের ঘাড়ে; অপরের খরচায়, বিনে পয়সায় পরিক্ষীত হবার অপূর্ব সুযোগ, এমন গোলডেন অপরচুনিটি কি হাতছাড়া করতে আছে?

ঘনশ্যাম তবু ঘাড় নাড়েঃ "তুমি আমাদের কেলাসেব পেঁচোকে বলে ছাখো। পাঁচ্‌কড়েটা পড়াশোনায় ভালো—সে গেলে কাজ দেবে।"

ঘনশ্যাম একনম্বর এবার চটে যায়ঃ "পাঁচকড়ে গেলে কাজ দেবে?" কি করে দেবে শুনি? তার নাম কি ঘনশ্যাম? ঘনশ্যাম মিত্তির কি সে? আমার নাম নিয়ে সে কি করে পরীক্ষা দেবে তবে? আমার তাতে বদনাম হবে না? তাছাড়া, মিথ্যে কথা বলা হবে না তাতে? মিথ্যে কথা বলা পাপ। অকারণে মিথ্যে বলা আমি পছন্দ করি না। মিথ্যেবাদীতার আমি বিপক্ষে। না ভাই, তাতে আমি নেই।"

দুনম্বরের ঘনশ্যাম আমতা করেঃ "তাহলে—তাহলে তো ভারী মুস্কিল! পাঁচকড়ের নামও ঘনশ্যাম নয়, কাজেই ও পাস করলে আমার পাস করাই হবে না! কি করে হবে?" ঘনশ্যাম ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

"তাইতো—তাইতো!—" আমাদের ঘনশ্যাম এবার কাবু হয়ে পড়েঃ "সারা স্কুলে কেবল আমারই নাম যে ঘনশ্যাম! এক তুমি বাদে কেবল। আমি আবার মিত্তির হয়েও মরেছি। কী সর্বনাশ, একে ঘনশ্যাম তার উপরে মিত্তির! মাটি করেছে দেখছি।"

ওর কণ্ঠস্বরে হতাশার ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

"সারা স্কুলে কেবল তোরই নাম ঘনশ্যাম। তার উপরে তুই মিত্তির! বুঝে ছ্যাখ তবে। তুই ছাড়া আর কারু কম্ম নয়, দেখছিস তো! ভেবে ছ্যাখ ভাই, অতগুলো টাকা জমা দিয়েছি, নষ্ট হবে সব। এত ক'রেও পাস করতে পাব না?"

পীড়িত ঘনশ্যাম সকাতর দৃষ্টিতে দুনম্বরের ঘনশ্যামকে প্রপীড়িত করে।

দুনম্বরের মন টলে একটুঃ "আচ্ছা পেলাম না হয়; কিন্তু—কিন্তু কোশ্চেন বুঝতে পারব কি? শক্ত শক্ত সব কোশ্চেন্?"

"কোশ্চেন পেপার পড়তেও পারবিনে?"

"পড়তে পারতে পারি; কিন্তু বুঝতে পারব কিনা কে জানে? ফাস্ কেলাসের বই-টই আমি নেড়ে চেড়ে দেখেছি, ঘেঁটে ঘুঁটে

দেখেছি আমি, কষ্টে স্বষ্টে যদিও বা একটু পড়া যায়, মানে টানে কিচ্ছু তার বোঝা যায় না।"

"অত বোঝাবুঝির কি আছে? পরীক্ষা দেয়া নিয়ে কথা। টেস্‌টে যখন এলাউ হয়েছিস পরীক্ষা দেবার তোর ন্যায্য অধিকার, বার্থ রাইট তোর। সোজাসুজি যাবি গিয়ে হলে বসবি—পরীক্ষা দিয়ে আসবি, ফুরিয়ে গেল! যা মনে আসবে, লিখে দিবি। যা খুসি লিখে যাবি। তারপর কি লিখেছিস্, মরুগ ব্যাটা এগ্‌জামিনার মাথা ঘামিয়ে। আমাদের ভারী বয়েই গেল।"

"কিন্তু যা তা লিখে যদি ফেল মেরে যাই? তাহলে?" ঘনশ্যামের মনে তবু একটা খচ খচ করে, দায়িত্বের গুরুভার যাদের মাথায় ভর করেছে তাদের এরকম করেই থাকে।—"তাহলেও আর পাস করতে পারব না। মানে তুমিই তো পাস করতে পারবেনা তাহলে। দুজনেই ফেল যাবো একসঙ্গে? তাহলে?"

"খুব পারবি, খুব পারবি। থার্ড-ক্লাসের ছেলে তুই, না হয় থার্ড ডিভিশনে পাস করবি। তাতে কি হয়েছে। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই! ক্ষতি কি আমার তাতে? আমার পাস করা নিয়ে কথা—তা করলেই হোলো। ফোর্থ ডিভিশনে না গেলেই হোলো আমার। ব্যস্।"

"অঙ্কে তোমার ভয় নেই ঘনাদা। অঙ্কে তোমার আমি প্রায় পাস করিয়ে দেব। আটাশ ত্রিশ নম্বর টেনে টুেন রেখে দেবো তোমার।"

"তাহলেই হোলো। আর বাংলাতেও পারবি। ইতিহাস ভূগোলেও পেরে যাবি। বাকী রইল সমস্কৃত আর ইংলিশ। তা তোর পাশে তো কেউ বসবে, কেউ না কেউ বসবেই। আরো তো পরীক্ষা দেবে কতো ছেলে। পাশের ছোঁড়াটার খাতা থেকে টুকে সাফ করে দিস্। তাহলেই হবে। তবে তোকে আর পায় কে? মারে কে আর?"

দুনম্বরের ঘনশ্যাম, আমাদের গল্পের ঘনশ্যাম, পরীক্ষা দিতে গিয়ে

যে ছেলেটির পার্শ্বলাভ করেছিল, তিনিই হোটেলের নায়ক, বর্তমান আমাদের বটকেষ্ট।

বটকেষ্ট খাতা দেখানোয় আপত্তি করেনি, অবাধেই দেখিয়েছে, উঁকি না মারতেই খাতা এনে মেলে ধরেছে চোখের সামনে। এমন কি খাতা দেখানোর চেয়ে, খাতা দেখবার দিকেই সে বেশী বোঁনাক দেখিয়েছে। প্রত্যেক প্রশ্নেই, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই, সে ঘনশ্যামের খাতা দেখতে চেয়েছে।

ঘনশ্যামই বরং তাকে খাতা দেখাতে ইতস্ততঃ করেছে! অম্লানবদনে সেই তাকে দেখাতে পারেনি বরং। কজনকে পাস করাবার দায়িত্ব সে ছোট্ট ঘাড়টিতে নেবে? পাস করাবার কিম্বা ফেল করাবার—সে যাই হোক!

তবু পরস্পরের টোকাটুকি সূত্র ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছিল তা এই ঃ বটকেষ্ট ঘনশ্যামের খাতা দেখে টুকেছে, ঘনশ্যাম বটকেষ্টর খাতা থেকে টুকেছে; হয়তো তার নিজের খাতা টুকে নেয়াটাই টুকে বসেছে আবার।

মোটের উপর বটকেষ্টই বেশী টুকতে পেরেছিল। বেশী বার তো নিশ্চয়ই। ঘনশ্যাম হাজার হোক আরো ছেলেমানুষ, বটকেষ্টর চেয়েও বয়সে কাঁচা, ওর মতো ততো কব্জির জোর তার নেই—তেমন কলম চালাতে পারেনি। কাজেই বটকেষ্টই টেক্কা মেরে বসেছে, এক একটা প্রশ্নের তিনবার জবাব লিখে, প্রথমে নিজে লিখে, তারপর ঘনশ্যামের টুকে, ফের ঘনশ্যামকে টুকতে দিয়ে তারপর আবার তারটা টুকে, জোড়া তালি মেরে অনায়াসে সে উৎরে গেছে। এ ছাড়া তার পাস করার এবং ঘনশ্যামের ফেল করার অন্ত আর কী অর্থ থাকতে পারে? পরীক্ষকেরা উত্তরের সমারোহ দেখে—দেবাক্ষরের চাপে গুলিয়ে গিয়ে, তিন তিনবার করে নম্বর দিয়ে ফেলেছে তা ছাড়া আর কী? অন্ততঃ বটকেষ্টর পাসলীলা সম্বন্ধে ঘনশ্যামের নিজের তাই ধারণা।

যাই হোক টোকাটুকির সূত্র থেকে কৃতজ্ঞতার সূত্র বেরিয়ে

আসা স্বাভাবিক। এবং উভয় সূত্রে জড়াজড়ি হয়ে জোট পাকিয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই পরীক্ষা দিতে দিতেই, বটকেষ্ট, ঘনশ্যামকে তাদের হোটেলে নেমন্তন্ন করে বসবে এ আর আশ্চর্য কি? অবশ্যি তৎকালে হোটেলটি ছিল বটকেষ্টর বাবার—বাবার হোটেলেই বটকেষ্টর খাওয়া দাওয়া চলছিল। তারপর বাবা ভবলীলা সাঙ্গ করলে, বাবার কাবার হবার পরে, সেই হোটেল এখন বটকেষ্টর।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে—এবং অন্য কোনো কারণে নয়; কেবল দীর্ঘসূত্রতার জন্যই, পুরোনো আলাপটা আর ঝালানো হয়ে ওঠেনি ঘনশ্যামের। এন্ট্রান্স ফেল করে ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরে গেছে, তারপরে আর কিছুতেই স্কুল মুখো হয় নি, থার্ড ক্লাস থেকেই পড়ায় ইস্তফা দিয়েছে। কী হবে আর পড়ে শুনে? ফেল করবার জন্যেই তো ফের পড়া? আর ফেল করে লাভ? ফেলকেষ্ট হতে কে চায়? বারম্বার ফেল করা—পুনঃ পুনঃ পাস করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হওয়া হয়রানি কেবল! পরীক্ষা দেয়ার যে কী মজা, হাড়ে হাড়েই সে তা টের পেয়েছে। কেবল টুকে যাও আর টুকতে দাও, এনতার খালি টোকাটুকি। আর, কোশ্চেনের মাথামুণ্ড একটা কথাও যদি বুঝতে পারো! দূর দূর! ওসবের মধ্যে শ্রীমান ঘনশ্যাম আর নেই। তার খুব শিক্ষা হয়েছে!

এতদিনে পুরানো পড়ার একটা কথাও ঘনশ্যামের মনে নেই তার কমা সেমিকোলন পর্যন্ত সে গুলে খেয়েছে, কিন্তু সেই কদমতলার বটকেষ্ট আর বটকেষ্টর হোটেলের পঞ্চাশ রকমের ইলিশ মাছ - তার বিন্দু বিসর্গও সে ভুলতে পারে নি।

এরপরে আমাদের গল্পের যবনিকা উঠবে কদমতলার একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। বটকেষ্টর হোটেলের কাছাকাছি একটা চা খানায়।

টুসি ডবল ডিমের আমলেট আর টোসটের মধ্যে যোগসূত্র

স্থাপনা করছে, একমনে সেই কার্যেই ব্যাপৃত, এহেন সন্ধিক্ষণে ঘনশ্যাম এসে তাকে আবিষ্কার করলেন।

"এই যে টুসি! বসে আছিস এখানে?"

টুসি কোনো জবাব দিল না। এমন অবান্তর প্রশ্নের—যার উত্তর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে—জবাব দেয়া বাহুল্যমাত্র।

চায়ের ঢোকটা গিলে ফেলল টুসি।

"আরেক পেয়ালা চা দাও।" ঘনশ্যাম লম্বা টেবিলকে মাঝখানে রেখে, টুসির সামনে বেঞ্চে জাঁকিয়ে বসলেন।

"খোকাকে নয়, আমাকে দাও এক পেয়ালা।" ঘনশ্যাম হাঁকলেন।

পাছে দাদু ভাগ বসায় সেই ভয়ে টুসি আগেই অমলেটের বাকীটুকু বাজেয়াপ্ত করে বসেছিল।

"ওহে আরেকটা অমলেট দাও ওকে।" আর আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা। টুসিকে খুশি করার মৎলব ঘনশ্যামের।

টুসি এবার মুখ খোলে: "একী বিচ্ছিরি জায়গায় এনে ফেলেছো দাদু বলো দেখি? এই কি তোমার পিকনিক?"

"পিকনিক আবার কাকে বলে?" ঘনশ্যাম সাফাই দিতে সচেষ্ট হন: 'পিকনিক মানে ত বাড়ির বাইরে গিয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়া?' বেশত, বাড়ির বাইরে তো আসা হয়েছে, এখন তুই যদি রাঁধতে চাস—রাঁধতে পারিস—তো রাঁধ না কেন? রাঁধতে পারলে কে বাধা দিচ্ছে? যাই না কেন রাঁধ, আমি তোকে কথা দিচ্ছি, খেয়ে যাব, খাব ঠিক। মুখ বুজে, যে করে হোক, খাবো ঠিক। সব রকমের রান্না খাবার অভ্যেস আছে আমার। পিকনিকও আমি খেতে পারি। হুঁ।"

"কোথায় তোমার পঞ্চাশ রকমের ইলিশ মাছ? কোথায় কি!"

"সে ওর বাবার সময়ে ছিল। এখন ওর হোটেল চলে না, কাজেই চুনো মাছ দিয়ে চালায়। বাপ মরে গেলে ও কি করবে? ওর বাপ মরে যাওয়া—সে কি ওর দোষ? আমারও দোষ নয়।"

"ছিরিপদর রান্নার কি ছিরি! খেলে বমি আসে।"

"না আজকে ভালো রাঁধবে দেখিস! আমি একটা টাকা দেব বলেছি ঠাকুরটাকে। একটা রুই মাছও আনিয়েছে আজ বটকেষ্ট। রামচরণ কুটছিল না?"

"কুটছিল না ঢেঁকি করছিল। তুমি একা বসে বসে রুইমাছ খাও দাদু। আমি—আমি—আমি—"

টুসি আমতা-আমতা করে। বলতে ওর কেমন বেধে যায়।

"কেন, কী হোলো তোর? তুই খাবিনে?"

"আমার মন টিকছেনা এখানে। আমি বরং কোথাও পালিয়ে যাই।"

"পালিয়ে যাবি?" দাদুর যেন দম আটকে আসে।

"তুমি কেন দাদু এমন পুতু পুতু করে আমাকে আগলে রেখেছ? আমি কি আর ছেলেমানুষটি আছি?"

ঘনশ্যামের চোখ কপালে ওঠে, মুখে কথা সরে না।

"দেশ বিদেশে যেখানে খুশি চলে যাই! যে দিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ি। রেলে করে জাহাজে চেপে এরোপ্লেনে চোড়ে যে দেশে ইচ্ছে, সে দেশে। আমাকে ছেড়ে দাও তুমি।"

"বড় হয়েছিস তুই? বটে! তুই খুব বড় হয়েছিস!"

ঘনশ্যামের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

"বাঃ, বড় হইনি আমি? কতো বড় হয়েছি। তুমি দাঁড়াও না আমার পাশে তোমার চেয়েও কত লম্বা আমি।"

টুসি দাঁড়িয়ে উঠে দাদুকে সমকক্ষ হতে আহ্বান করে।

"তা বটে! ঢের বড় হয়েছিস বটে!" ভাঙা গলায় দাদু বলেন। দাঁড়াবার তাঁর উৎসাহ হয় না।

"তবে? তবে কেন তুমি আমাকে বেঁধে রাখবে? বাড়িতে আটকে রাখবে দিন রাত? স্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর স্কুল—উঃ, এমন একঘেয়ে। এর চেয়ে যদি যুদ্ধে চলে যাই সেও খুব ভালো।"

"যুদ্ধে!" ঘনশ্যামের ভুঁড়ি এবার কেঁপে ওঠে—টর্পেডোর ধাক্কা লাগে যেন হঠাৎ। "এতটুকু ছেলে, তুই যাবি যুদ্ধে!"

"আমি বুঝি বন্দুক ছুঁড়তে পারি না তুমি ভাবো? আমার এক বন্ধুর এয়ার গান প্র্যাকটিস করে করে হাত পচে গেল আমার। দাও না একটা বন্দুক, দেখিয়ে দিচ্ছি এখুনি।"

"না না! যুদ্ধে যাসনে! খবরদার না!" ঘনশ্যাম ভীত হয়ে উঠেন: "যুদ্ধে ভারী খুনোখুনি। যুদ্ধে গেলে মানুষ মারা যায়। যুদ্ধে গেলে তুই আর ফিরবি নে।"

ঘনশ্যামের জোরালো গলা, করুণ হয়ে, ঘোরালো হয়ে জমে আসে।

"না ফিরি নাই ফিরব! এরকম বেঁচে থাকার চেয়ে মারা যাওয়াও ভালো। বাঁধা-ধরার মধ্যে বেঁচে থেকে সুখ নেই। সত্যি দাদু, তুমি আমাকে দিনকতকের জন্য পালিয়ে যেতে দাও, তা না হলে—তা না হলে—তা নাহলে আমি যে কী করব ভেবে পাচ্ছিনে!"

ভাবতে ভাবতে টুসি চা-খানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দফার ডবল ডিমের অমলেট এসে তার টেবিলে অপেক্ষা করতে থাকে, সে ফিরেও তাকায় না। দারুণ বৈরাগ্যের তাড়নায়, সারা বিশ্বের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে তখন বেরিয়ে পড়েছে (এবং অমলেট বিশ্বেরই অন্তর্গত, বিশ্বছাড়া কিছুই নয়); অমলেটকে বিশ্বশুদ্ধ অথবা অমলেটসুদ্ধ বিশ্বকে একসঙ্গে এবং যুগপৎ বর্জন করে বটকেষ্ট এবং ঘনশ্যাম—আপনার দাদুই কি আর পরের দাদাই কি—সবার প্রতি সমান পরাঙ্মুখ হয়ে, সবকিছু ছেড়ে, সমস্ত জানাশোনার বাইরে, নিরুদ্দেশে কোথাও, সে তখন, তখন-তখনি পালিয়ে যেতে চায়।

ঘনশ্যাম হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন অভুক্ত অমলেটের সম্মুখে। তাঁর মুখ থেকে খালি বেরয়:

"টুসি এতদিনে বড় হয়েছে! সেই টুসি।"

পা যেন তাঁর খেলতে চায় না। বসেই থাকেন ঘনশ্যাম। সেই

চা-খানাতে। উঠবার-ছুটবার ছুটে গিয়ে পাকড়াবার তাঁর শক্তি নেই—চোখের সামনে—চায়ের পেয়ালা জুড়োতে থাকে তাঁর।

অনেকক্ষণ পরে ঘনশ্যাম হোটেলে ফিরলেন। ফিরলেন কোনো গতিকে।

"একি? চোখে জল কেন? কাঁদছেন না কি? অ্যা?"

বটকেষ্ট সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

"ভাই বটকেষ্ট! খোকা পালিয়েছে। পালিয়ে গেছে টুসি! সে আর নেই! কী হবে ভাই?"

ঘনশ্যামের চোখ বেয়ে আরেক পশলা জল নেমে আসে।

বটকেষ্ট আরো বিস্মিত হন:

"কেন? টুসিতো অনেকক্ষণ এসেছে। রুইমাছ ভাজছিল, তখন এসেছে সে। এক প্লেট মাছ ভাজা নিয়ে উপরে চলে গেছে। কতক্ষণ তো!"

"অ্যাঁ? তাই নাকি?" ধারা বর্ষণের মাঝখানে, মেঘের ঘোমটা চিরে সূর্যের মুখ উঁকি মারে হঠাৎ: "অ্যাঁ পালায়নি তাহলে? টুসি যায়নি তবে?—" বর্ষার ফাঁক দিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসে। ঘনশ্যামের চোখে আবার রোদের ঝিলিক। সারা মুখে আলোর ঝিকিমিকি!—

আঃ, টুসি আমার ভারী ভালো ছেলে!—"ঘনশ্যামের আনন্দ উথলে ওঠে: "মাছ ভাজা খাচ্ছে টুসি! আঃ!"

বামুন ঠাকুর খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সে আপ্যায়িত হাসি হেসে বল্ল: "আমি নিজে হাতে মাছ ভেজে দিয়েছি খোকাবাবুকে। এক রেকাবি ভর্তি! খোকাবাবু নিজে ভাজতে চাইছিলেন, পারবেন কেন? এসব কাজ কি ভদ্দর নোকের ছেলের পোষায়? রান্না কাজ কি অতো সোজা? ভদ্দরলোকের কম্ম না! কি বলেন কত্তা?"

"এখন কি হয়েছে? এখনই কি? এখন ত খালি মাছ ভাজাই মারছে! মাছ ভাজার উপর দিয়েই যাচ্ছে এখন!—" বটকেষ্ট

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেনঃ "এর পর ও আপনার হাড়, মাস খাবে, হাড় মাস ভাজা ভাজা করে খাবে তবে ও ছাড়বে। ও যা ছেলে!"

এ কথার কী জবাব দেবেন ঘনশ্যাম ভেবে পান না। নিজ মুখে নিজের নাতির গুণগান শুনতে তাঁর লজ্জা হয়। তাছাড়া; বটকেষ্টর মুখের উপর প্রতিবাদ করতেও তাঁর সাহসে কুলোয় না।

কিন্তু প্রতিবাদ আসে। অপ্রত্যাশিত স্থল থেকে। রাঁধুনে বামুনই আপত্তি না করে পারে না—ভাজা মাছের যোগান দিয়ে একটু আগেই টুসির কাছ থেকে সে একটা সিকি বখশিস্ পেয়েছে—এত তাড়াতাড়ি বখশিস্ হারামি করতে তার কুষ্ঠিতে বাধে।

"তাতে আপনার কি বাবু? ওঁর ছেলে ওঁর হাড় খাক মাস খাক, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাক তাতে আপনার কি? আমারই বা কি? দাদুর বিষয়ে নাতিরই তো অধিকার? যে যা খুসি করবে, আমাদের বলবার কি আছে?"

"তা—তা—তুমি যা বলেছ ঠাকুর!—" বটকেষ্ট তো তো করেন।

"ঠিক কথা না তো কি বেঠিক কথা? অন্যাথ্য কথা কখনো আমার মুখ থেকে বেরোয় না বাবু! এখন ও ছেলে যুগ্যি ছেলে, সব করতে পারে ও। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ সোমত্ত ছেলে বলতে কি! যা খুসি করবে এখন! কথায় বলে, যোগ্য পৌত্র দাদুর সমান।"

"তুমি ঠিক কথা বলেছ বামুন ঠাকুর।—" ঘনশ্যাম সাহসী হয়ে এবার সায় দেনঃ "আমাদের চাণক্য পণ্ডিতও তাই বলে গেছেন। বলে গেছেন, লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি। তার মানে, ছেলের পাঁচ বছর পর্যন্ত তাকে লালন করবে—"

"সে আর লালন করতে হয় না বাবু!" বামুনঠাকুর বাধা দিয়ে বলেঃ "আপনার থেকেই ওদের লাল পড়ে। আর সে যা লাল আরে—ছ্যা!" বামুনঠাকুরের মুখখানা ভারী ব্যাজার হয়ে যায়।

"দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ! আর দশবছর ছেলেকে তাড়না করবে।

তার মানে, ছ থেকে পনের পর্যন্ত কেবল তাড়া দেবে কসে।"
ঘনশ্যাম চাণক্য-শ্লোকের দ্বিতীয় কিস্তি জমা দেন।

"হ্যাঃ, তাড়া দিতে হয় না!" এবার বটকেষ্টর মুখ ভারী হয়ে ওঠেঃ "তখন নিজের তাড়াতেই তারা অস্থির! একটু দাঁড়াবার তাদের ফুর্সৎ আছে নাকি! ওই বয়সে ওদের নাইবার খাবার সময় নেই বলতে গেলে। এই মার্বেল খেলছে, এই ঘুড়ি উড়াচ্ছে, এই স্কুল পালাচ্ছে। এই গাছ থেকে পড়ছে, এই পুকুরে ডুবে মরছে—বাব্‌বাঃ। ছেলে তাড়াবে কি, নিজেকেই তার পিছু পিছু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াও!"

"তবেই বোঝ! চাণক্য পণ্ডিতের কথা কিছু মিথ্যে নয়!—" ঘনশ্যামের মুখ হাসি খুসিতে আরো বেশী উন্মুক্ত হয়ে পড়েঃ "তাহলেই এখন চাণক্য পণ্ডিতের তার পরের কথাটা ভেবে ত্যাখো। সমস্ত একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। বুঝতে পারবে, চাণক্য পণ্ডিত পিতা পুত্রের মধ্য ঐক্যই চান, অনৈক্য নয়।"

"কি বলেছেন চাণক্য, শুনি?" বটকেষ্টর সন্দিগ্ধ প্রশ্নঃ "কী চেয়েছেন, উক্ত মুনীবর?"

"প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্র বদাচরেৎ!—" যেই ছেলে ষোলো বছরে পা দেবে, তেমনি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে—বন্ধুর মত ব্যবহার করবে তার সঙ্গে। আর-আর-আমার টুসি—" ঘনশ্যাম একটু সলজ্জভাবেই সংবাদটা ঘোষণা করেনঃ "টুসি তো ষোল বছরেই পড়েছে সেদিন।"

"তবে আর কি! তবে তো মাথা কিনে নিয়েছে আমাদের! তাহলে আর কি? নাতির সঙ্গে মিতালি পাতান এইবার। ওর খয়ের খাঁ গিরি করে জীবনযাত্রা চালান আর কি? দেবে নাকি আপনাকেও এক প্লেট মাছ ভেজে? দেবে?" বটকেষ্টর বাজখাঁই আওয়াজ।

চাণক্য পণ্ডিতের কাছ থেকে অতবড় আত্ম-সমর্থন পেয়ে ঘনশ্যাম আর বটকেষ্টর কথায় কান ত্যান না। দেবার প্রয়োজনই বোধ

করেন না। ঠিক এই ধরনের একটা কিছু যেন তিনি খুঁজছিলেন, মুণীঋষিস্থলভুক্ত কারো মুখনিঃসৃত এই জাতীয় বেদবাক্য—যার নজীর পেলে, এখনই তিনি উপযুক্ত প্রপৌত্রের বাদশাহী মেনে নিয়ে নিজেকে নাজির পদের গৌরব দান করতে পেছপা হন না।

"ঠাকুর, হ্যাঁ, কি বল্লে তুমি? আমার নাতি মাছ ভাজতে গেছল নাকি? অ্যাঁ?" ঘনশ্যামের স্বরে ঘনীভূত বিস্ময়।

"পারবে কেন বাবু? মাছ ভাজা কি চাট্টিখানি? আপনারা ভাবেন খুব সোজা কাজ নাকি? কেমন যে কঠিন কাজ—জানে কেবল দুজন', যে ভাজে আর যে ভাজা পড়ে। যে খায় সে তার কি জানে বাবু?..."

"তা পারল না বুঝি ভাজতে? পারল একদম?"

"দু একখানা ভাজল বইকি! আধপোড়া আধকাঁচা করে ভেজে ছেড়ে দিল। যেমনি না কড়াইয়ের তেল চড়চড় করে উঠেছে অমনি না খুন্তি ফেলে এক লাফ। গরম গরম তেলের ছিটে লেগে খোকাবাবুর হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে, আমি আবার ঠাণ্ডা তেল রগড়ে দিয়ে আরাম করি।"

"অ্যাঁ? টুসির হাতে ফোস্কা পড়েছে! অ্যাঁ—অ্যাঁ?" ঘনশ্যাম বাঁ হাত দিয়ে নিজের ডান হাতে হাত বুলোতে থাকেন—যেন তাঁর নিজের হাতেই ফোস্কাটা এসে গজিয়েছে!

"ধন্যি করলেন ঘনশ্যামবাবু! ধন্যি করলেন দেখচি! ইতিহাসে নাম রেখে গেলেন একখান। এতবড় কীর্তি ভূভারতে আর কেউ করতে পারেনি—বাঃ! নাতির হাতের ফোস্কা আপনার নিজের হাতে ফসকে চলে এল। ধন্য ধন্য। অনেক পৌত্রবৎসল দেখেচি বটে, কিন্তু আপনার জোড়া মেলা ভার। আপনাদের জোড় মেলানো শক্ত! সাধু সাধু! দাদুও এত স্ত্রৈণ হয় নাতির উপর—ছি ছি!"

ঘনশ্যামের আচরণে বটকেষ্ট প্রাণে বড় ব্যথা পান।

"তা হাত ওর বেশী পুড়ে যায়নি তো?" ঘনশ্যামের তখন

অপরের উচ্চ প্রশংসায় কর্ণপাত করার ফুরসৎ নেই, নিজের নাতির ভাবনাতেই তিনি কাতর। বটকেষ্ট প্রদত্ত বক্রোউক্তি তিনি ঐ একবাক্যে তুচ্ছ করে দিয়েছেন।

"না না বেশী পুড়বে কেন বাবু! আমি তো কাছেই ছিলাম। চলে যাইনি তো কোথাও। খোকাবাবু লাফিয়ে উঠে বলছেন, কি বাপরে বাপ! কী সুখে যে লোকে যুদ্ধে যায়! সামান্য একটু গরম তেল পড়তেই আমি অস্থির, গোলাগুলির ছ্যাঁকা লাগলেই তো আমার হয়েছে! মরতে আমি ভয় খাইনে, কিন্তু বাপু, আধপোড়া হতে হলেই আমি গেছি! এই কথা বলে যা মাছ ভেজে রেখেছিলাম সব প্লেটে ভর্তি করে নিয়ে চোঁ চোঁ করে সটান উপরে চলে গেলেন।"

"অ্যাঁ!—এই কথা বলল নাকি! বল্ল নাকি টুসি! -" বলতে বলতে ঘনশ্যাম নিজেই সহসা পঞ্চবর্ষাণি হয়ে পড়েন—তাঁর লাল পড়তে থাকে। মাছ ভাজার উপর দিয়েই যে এতবড় একটা যুদ্ধের ফাঁড়া কেটে গেল—একথা ভাবতেই সমস্ত মৎস্য জাতির প্রতি—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা উত্তমরূপে ভর্জিত সেই সম্প্রদায়ের উপর—কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে। মৎস্যরা যে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবতার এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে যা কিছু সন্দেহ আগে ছিল তা এই মুহূর্তে তিরোহিত হয়ে যায় তাঁর। এত জন্তু জানোয়ার থাকতে দুনিয়ার যাবতীয়কে অবহেলা করে ভগবান কেন যে ব্যগ্র হয়ে সর্বপ্রথমে মৎস্যরূপ ধারণ করতে গেছলেন তারও সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পান।

তৎক্ষণাৎ তিনি পকেট থেকে দুখানা দশটাকার নোট বার করে ঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে দ্যান্ঃ

"যাও, এক্ষুনি যাও! জেলে ডাকিয়ে গঙ্গায় জাল ফেলার ব্যবস্থা করো। এক্ষুনি একগাদা ইলিশ মাছ ধরে আনা চাই! তারপর সেই মাছ কেটেকুটে, উনপঞ্চাশ রকমের ইলিশ মাছের রান্না বানাও—ভাজা থেকে শুরু করে অম্বল অবধি যত কিছু তোমার জানা আছে—কিছু না যেন বাদ যায়! ইলিশ মাছ

ভাতে থেকে আরম্ভ করে ইলিশ মাছের লটপটি পর্যন্ত! ইলিশ মাছের রোস্ট—ইলিশ মাছের টোস্ট—ইলিশ মাছের কারি কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব কালিয়া—ইলিশ মাছের মালাইকারি কিছু যেন বাদ যায় না! ইলিশ মাছের দম আর ইলিশ মাছের বড়া, ইলিশ মাছের ছোকা আর ইলিশ মাছের ধোঁকা—ইলিশ মাছের ঝাল আর ইলিশ মাছের ডালনা, ইলিশ মাছের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের কচুরি, ইলিশ মাছের চপ কাটলেট, মোগলাই কারি, ইলিশ মাছের অমলেট, ফিশফ্রাই এমনকি ইলিশ মাছের ফাউল কাটলেট, মাটনচপ—সমস্ত আমার চাই। ইলিশ মাছের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ব আজ। আমরা দাদুনাতিতে ওদের মাথা খেয়ে তবে ছাড়ব! বুঝেছ!"

মৎস্য জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা-পীড়িত, ধন্যবাদমুখর ঘনশ্যাম আজ নানারূপে, নানান্ ভাবে মৎস্য অবতারের উপাসনা না করে—নিজের উথলে ওঠা আন্তরিক ভক্তির পরিচয় না দিয়ে নিরস্ত হবার পাত্র নন্। ভগবানের অবতারদের মধ্যে মৎস্য কেবল যে সবার প্রথম তাই নয়, সকলের চেয়ে উত্তম, মৎস্যের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ অবতারনা স্বয়ং ইলিশ। এঁকে চোখে দেখলেই অন্তরে ভাগবত ভাবের সঞ্চার হতে থাকে, চেখে দেখলে তো কথাই নেই! যিনিই একবার এঁর স্বর্গীয় রসাস্বাদ করেছেন তিনিই মরেছেন চিরদিনের মতই খতম্ একেবারে। ইলিশ যে একেমেবাদ্বিতীয়ম্ একমাত্র আর অদ্বিতীয় একথা তার জীবনে আর অস্বীকার করার উপায় নেই! যে কোনো ইলিশ উপাসককে একটু বাজিয়ে দেখুন না, দেখতে পাবেন, ইলিশের রূপেগুণে সে কি রকম বিভোর হয়ে আছে, শুনতে পাবেন তার গদগদ কণ্ঠ থেকে, তার তন্ময় অভ্যন্তর থেকে, কি রকম সুললিত প্রার্থনার বাণী কিরকম আকুলি বিকুলি করে বিগলিত হতে থাকে!

অতএব ঘনশ্যাম—স্বর্গীয় লালসায় লালায়িত ঘনশ্যাম—ইলিশের উপরেই তাঁর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হলেন।

তাছাড়া টুসিরও ঝোঁক ইলিশের উপর—ওই মাছটার পরেই ওর রোখ বেশী! ওকেও তো খুশী করা চাই! এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে—শ্রীভগবানও তৃপ্ত হবেন আর ভগবানের প্রসাদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে নাতির পরিতৃপ্তি! এবং ঘনশ্যামের উপ্‌রি মনস্তুটি—এককথায় যাকে বলে তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম! শাস্ত্রে কি আর মিথ্যা বলে?

"বুঝলে ভায়া বটকেষ্ট, চাণক্য শ্লোকের অন্যথা করা কোনো কাজের কথা না! প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে বুঝলে ভায়া! ছেলে বয়সে বাড়লেই তার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় বাড়াবাড়ি করবে। শাস্ত্রবাক্য কি অমান্য করতে আছে ভায়া! করলেই নানান্ ঝঞ্ঝাট! অতএব বুঝেচ কিনা পুত্রমিত্র বদাচরেৎ! আর পুত্রও যা নাতিও তাই —নাতি কিছু নাতিবৃহৎ নয়।

ঘনশ্যাম বটকেষ্টকে লক্ষ্য করে ভালো করে শানিয়ে চাণক্য শ্লোকটা ছুঁড়ে দ্যান্ এবার।

ইলিশ মাছ রান্নার ফিরিস্তি শুনেই বটকেষ্ট হাঁ হয়ে গেছলেন। —চাণক্য শ্লোকখানা এসে পড়তেই আবার তাঁর মুখ নড়তে শুরু করে: "ছেলে যদি বদ হয় তাহলেও? তাহলেও বদাচরেৎ?"

"উনি আর ছেলেকে বেশী কি বদ করবেন! ছেলে কি ওঁর বদ হতে বাকী আছে কিছু?" চাণক্য শ্লোকের আরেকজন সমঝদার—হোটেলের চাকর, সেও এই ফাঁকে মাথা নাড়তে কসুর করে না।

ঊনপঞ্চাশ রকমের রান্নার ঘনঘটায় ঠাকুরের চোখ কপালে উঠে গেছল—দুখানা নোট তার স্বহস্তে বিরাজ করলেও, এমনকি তার থেকে জেলের জাল গলে তারও কিছু লভ্য নির্গলিত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, রান্নার ফর্দ আর পরিশ্রমের বহর কল্পনা করে, না ছিল তার নিজের সুখ, না ছিল পরের নাতির প্রতি সহানুভূতি। ঊনপঞ্চাশ ব্যঞ্জনের সমস্ত ব্যঞ্জনা তার একমাত্র মুখপত্রে প্রকাশিত হয়:

"বধ আর কত্তে হবে না কত্তা! এত মাছ একদিনে পেটে গেলে ছেলে আপনিই পটল তুলবে—পত্রপাঠ মারা যাবে।"

"মারা যাবে? তুমি বলছ কি হে? ও ছেলে কি মরবার? তুমি দেখে নিয়ো, অত মাছ গিলেও ও ছেলে আস্ত থাকবে। কিছু হবে না ওর। মাছ খেয়ে ও ছেলে যদি মারা পড়ে তাহলে আমার নাম—আমার নাম—কি বলে গিয়ে আমার নাম তাহলে—ইয়েই নয়!"

কী আশ্চর্য, বটকেষ্ট নিজের নাম ভুলে গিয়েছেন।—

প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে—চাণক্য বলে গেছেন—পুত্রমিত্র বদাচরেৎ! কিন্তু সে পুত্র যদি বদ হয়, তাহলে কি রকম আচরণ করবে তার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলে যান নি। এবং সে যদি পুত্র না হয়ে নিতান্তই পৌত্র হয় (আর পুত্রের মতই বদ হয়) তাহলে কী কর্তব্য সে বিষয়েও চাণক্যের একটা কিছু বাৎলে যাওয়া উচিৎ ছিল, দাদু এই কথা ভাবছিলেন। একটা ছেলেকে তো একেবারে বধ করা যায় ন—বিশেষ করে নিজের ছেলের ছেলেকে!

কিন্তু যাঁরা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা বল্ল, "অত দুঃখ করছেন কেন মশাই? একেবারে না হোক, এককোপে না হোক, ছেলেটাকে তো আপনি তিলে তিলে বধ করেছেনই! বলতে কি অত আদর দিয়ে ওর মাথাটা আপনিই তো চিবিয়ে খেয়েছেন।"

দাদু এতে ঠিক সান্ত্বনা পা'ন না। বুড়োদের যেমন কথা। নাতিকে আদর করবেন না, বারে! নিজের নাতিকে আদর করবেন না তো কি পরের হাতীকে ধরে আদর করতে যাবেন?

সন্তানদাতাদের এরকম ঘেরাও হয়ে আক্রমণের কারণ, আজ সকালেই তাঁর ষোড়শবর্ষীয় নাতি তাঁর সঙ্গে ঘোরতর কলহ করে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। কলহের হেতু এমন কিছু না। উল্লেখের অযোগ্য একটা যা-তা ছুতো উপলক্ষ করে—একধারে দাদুর গোঁ, অন্যধারে নাতির গোঁয়ারতুমি—যা নিয়ে চরাচরে যাবতীয় দাদুনাতির

মধ্যে চিরকাল দ্বন্দ্ব বেধে আসচে—কিন্তু সেই যৎসামান্য অজুহাত থেকেই, নিউটনের সুবিখ্যাত আপেল পতনের মতই অভাবিত অভাবনীয় এই বিপর্যয় ব্যাপার!

দিকে দিকে, এদিকে ওদিকে, দিগ্বিদিকে তিনি লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এসে একটা খবর দিতে পারেনি। ছেলেটা কোন্ তীর দিয়ে তিরোহিত হয়েছে, কারু মুখে টুঁ শব্দ পেলেও তখুনি তিনি তীর বেগে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কখন থেকে তিনি হাঁসফাঁস করছেন কিন্তু এখন অবধি ঘুণাক্ষরেও একটা সংবাদ এসে পৌঁছল না।

অবশেষে খবর এল। ভগ্নদূতের মুখে বার্তা পাওয়া গেল, ছেলে কদমতলা ইষ্টিশনে হাওড়া-আমতার রেলগাড়ী চেপে পিট্‌টান দিয়েছে। কদমতলার ছেলে কদমতলা ইষ্টিশনেই গাড়ী চাপবে এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না; কিন্তু সেই লোকটির মারফতে নাতির যে চিরকুট পেলেন তাই পড়ে দাদু হতবাক হয়ে গেলেন।

তাতে লেখা ছিল: "দাদু, তুমি মিছে আমার অনুসন্ধান কোরো না। আমার খোঁজ পাবে না। এখান থেকে সোজা আমি করাচী চললাম। সেখানে এয়ার ট্রেনিং নিয়ে পাইলট হয়ে সরাসরি যুদ্ধে চলে যাব। আমার জন্য ভেবো না তুমি। আমার জন্য ভাবনার আর রইল কি? আমি—আমি তো মারা যাব না! সহজে মরবার ছেলে আমি নই; এইটুকুই মাত্র সান্ত্বনার ছলে বলতে পারি। ইতি—"

চিরকুট পড়ে দাদু বললেন—"অ্যাঁ? হাওড়া-আমতার রেলগাড়ী চেপে করাচী চল্ল কি রকম? ও গাড়ী তো করাচী পর্যন্ত যায় না। ও তো আমতায় গিয়েই থেমে যাবে, যদ্দূর আমি জানি......"

তিনি নামতা ভুলে গেলেন। তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ডেকে যে-কাপড়ে ছিলেন সেই কাপড়েই হাফ হাতা জামা গায়ে আর তাপ্পিমারা জুতো পায়ে, হাওড়া-আমতা করতে করতে, ভোঁ-ভোঁ-ভরর্-ভরর্-ভরর্র্র্ শব্দে সবেগে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সান্ত্বনাদাতারাও বলতে বলতে চলে গেল—ক্ষুণ্ণ হয়ে চলতে চলতে বলে গেল—"যান, ছেলে করাচী গেছে, আপনিও ওর কাছাকাছি যান। রাঁচী চলে যান।"

ট্যাক্সি বেগে যেতে যেতে দাদু মনে মনে মানসাঙ্ক কষেন—কদমতলায় গাড়ী চেপেছে আটটা চারে; এতক্ষণে সে গাড়ী বালটিকারী, বাঁকড়া, শলপ্—এ সমস্ত পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়! এখন আন্দাজ নটা পনেরো। তাহলে কুস্তুলিয়া, মাকড়দা, ডোমজুড় —এসব ইষ্টিশনও পার হয়ে গেছে। আটটা চারে কদমতলায় চাপলে মাকরদায় পৌঁছুতে আটটা চল্লিশ—ডোমজোড় আটটা একান্ন—দক্ষিণবাড়ী নটা দুই। (হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ীরা কখন কখন ছাড়ে—কোথায় ছাড়ে আর কোনখানে ধরে, কখন কোথায় ধরা পড়ে, ইতিমধ্যেই এসব বার বার রপ্ত হয়ে এখন দাদুর নখদর্পণে) তাহলে তাকে ধরতে হলে ধরতে হবে-সেই গিয়ে বড়গাছিয়া জংশনে! তার এধারে নয়। বড়গাছিয়ায় গাড়ী পৌঁছবে নটা আঠারোয় আর ছাড়বে নটা ছাব্বিশে। এর মধ্যেই হতভাগাটাকে হাতে নাতে পাকড়ে গ্রেরেপ্তার করতে হবে করাচীতে পৌঁছবার আগেই।

এবং তিনি নিরুদ্দিষ্ট ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বড়গাছিয়ার দিকে আরও তাড়া দিয়ে চালাবার বরাদ্দ দেন। এমন কি, বড়গাছিয়ার গাড়ী ধরিয়ে দিতে পারলে ইষ্টিশনে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেবার সাথে সাথেই উপরি আরো দু'চার আনার বখশিস্ দেবার লোভ দেখাতেও কসুর করলেন না।

হাওড়া-আমতা রেলগাড়ী গার্ডের কাছে এ অঞ্চলের যাত্রীরা প্রায় সবাই মুখচেনা। কে যে কোথায় ওঠে আর কোথায় নামে, কারা কোন্ ইষ্টিশনের, কত দূর অবধি কার দৌড়, তা তাদের দেখলে তো কথাই নেই, না দেখেও বলে দিতে তিনি পারেন। এবং এ গাড়ীর যাত্রীরা যে কোন গোত্রের, তাও তাঁর জানতে বাকী নেই।

এই কারণে হাওড়া-আমতার ফার্ষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ড যখন কদমতলা ইষ্টিশনে, বছর ষোলোর একটি ফুটফুটে ছেলের কলেবরে একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মুখ, একখানা ফার্ষ্টক্লাস কামরা একলাই দখল করল দেখলেন, তখন তাঁর বেশ একটু বিস্ময় বোধ হল। ছেলেটি তাঁর অচেনা তাই তাঁর বিস্ময়ের কারণ নয়; সে যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশলাভ করেছে তাও হয়ত না, যদিও হাওড়া-আমতার রেলগাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর কামরা ঐ একটিই আর একমাত্রই, এবং তার আরোহীও অতি কদাচিৎ; কিম্বা যেহেতু ছেলেটিকে দেখে, তার কব্‌জিতে হাতঘড়ি, বুকপকেটে দামী ফাউণ্টেন পেন, পায়ের পাম্পশু, টুইডের হাফপ্যাণ্ট আর স্মার্ট হাফশার্ট তার চকচকে চেহারার সঙ্গে ঝকঝকে পোষাক মিলিয়ে দেখলে অত্যন্ত বড়লোকের ছেলে বলেই সন্দেহ হয়—হাওড়া-আমতা রেলগাড়ীর যে কোনো কামরাতেই এ দৃশ্য অতি দৈবাৎ এবং অতীব বিরল—কেবল তাই যে তাঁর অতিরিক্ত বিস্ময়ের কারণ তা বল্লেও অত্যুক্তি হবে। অথচ এই সমস্ত জড়িয়েই তিনি নিজেকে বিস্ময় জর্জর বোধ করছিলেন।

কে এই ছেলেটি? কোথ্‌থেকে এল? কাদের ছেলে? আর যাবেই বা কোথায়? গাড়ীর আন্দোলনের সঙ্গে মিশ খেয়ে এই সব প্রশ্ন তাঁর মনে রীতিমত আন্দোলন তুলেছিল। ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন, যতই তিনি এসবের কোনো কিনারা করতে পারছিলেন না, তাঁর মনের আলোড়ন শনৈঃ শনৈঃ ততই আরো বেড়ে উঠছিল।

এবং এই আলোড়ন একেবারে উত্তুঙ্গ হয়ে ঠেলে উঠল, যখন তিনি দেখতে পেলেন বড়গাছিয়া ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে, তাঁর গার্ড ভ্যানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যখন তিনি দেখলেন—পতাকা উড়িয়ে ট্রেন-ছাড়ানো হুইসল্ দেবার অন্তিমক্ষণের একটু আগে হাফ্ হাতা জামা গায়ে, আধময়লা খাটো কাপড়ে, উসকো খুসকো একজন মুশকো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল এবং ঐটুকু সময়ের মধ্যেই

গাড়ীর এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক কামরার মধ্যে কুটিল কটাক্ষ হেনে এক দৌড়ে তিন চক্কর ঘুরে এল—যেন সমস্ত গাড়ীখানাই তার হাঁ করে গেলবার মৎলব। অবশেষে প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছে এ.স—কাছাকাছি এসে—চক্ষের পলকে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক পলকের জন্যেই! কামরার মধ্যে যেন সে হঠাৎ গোলকুণ্ডার খনি আবিষ্কার করেছে, তার গোল গোল দুটো চোখ এমনি করে জ্বলে উঠল যেন! তার সেই হীরকোজ্জ্বল দৃষ্টি, হীরার মত ধারালো চাউনি—হাওড়া-আমতা ফার্ষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু যেন স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করলেন!

গাড়ী বড়গাছিয়া ছাড়ল আর গার্ডের উত্তেজনাও সীমা ছাড়াল।

প্রথম দর্শনেই তিনি পরিষ্কার বুঝে ফেললেন—এই মুশকো লোকটি আস্ত একটা বদমাস্, এক নম্বরের পাকা ডাকাত। কোন এক বড়লোকের ছেলে হাতঘড়ি ফাউন্টেন পেন লাগিয়ে এই গাড়ীতে চলেছে, কোত্থেকে এই খবর পেয়ে সেগুলো বাগিয়ে নেবার মৎলবে পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে। বড়গাছিয়াতেই ছেলেটার নাগাল পাওয়া যাবে এমনও হতে পারে—হয়ত আগে থেকেই তার জানা ছিল।

বাংলাদেশ থেকে যতগুলি রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী বার হয়, আমাদের গার্ডবাবুটি তাদের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। এবং তাঁর পড়াশোনা যে ব্যর্থ হয়নি, বিফল হয় নি, কেবলমাত্র আকার প্রকার দেখেই এই মুশকো লোকটিকে পরিপাটিরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারাটাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ!

অত্যন্ত সম্প্রতিই, 'রেলগাড়ীতে রাহাজানি' বলে লোমহর্ষক একখানি বই তিনি পড়েছিলেন—

এবং তার পরেই, তাঁর গাড়ীতেই আজ এমন কাণ্ড! ভাবতে ভাবতে তাঁর উত্তেজনা চরম সীমায় উঠল। তিনি চাঞ্চল্য দমন করতে পারলেন না. তাঁর ছোট্ট কামরাটির ভেতরেই ছটফট করে পায়চারি করতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি আর কী করতে পারেন? এখন পর্যন্ত লোকটি তাঁর পাশের কামরায়, একশো এগারো নম্বরেই বসে আছে, এখনো এক নম্বরের প্রথম শ্রেণীতে পদার্পণ করেনি। কিন্তু পরের ইষ্টিশানেই সে যে কামরা বদলে ফেলবে এ তিনি দিব্যনেত্রে দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখলেই বা কী? রাহাজানি থামাতে তিনি কতদূর আর কি করতে পারেন? তিনি তো পুলিসের কর্মচারী নন! আইনতঃ কতটুকু তাঁর এক্তিয়ার?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাস্তবিক, ভেবে দেখলে তাঁর দৌড় খুব বেশী দূর নয়। এমন কি এক নম্বরের কামরাতেই, ছেলেটি সীমান্ত ঘেঁষে যদি ওই এক নম্বরের বদমাইসটিকে দেখা যায় তাহলেই বা তিনি কি করতে পারেন? বড় জোর গিয়ে তার টিকিট চাইতে পারেন। যদি সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখিয়ে ছায়, তাহলেই তো চক্ষুস্থির। বিনা টিকিটে উঠে থাকলে বাড়তি ভাড়া, জরিমানাসমেত ধরে দিলেই ব্যস, চুকে গেল সব। তাহলেই তাঁর হম্বিতম্বি সব ফুরিয়ে গেল। গাড়ী থেকে ঘাড় ধরে সমারোহ করে নামাবার সব ক্ষমতা খতম্।

দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে পাতিহাল এসে পড়ল। পাতিহালে থামতেই চারধারের হালচাল দেখবার জন্য গার্ডবাবু নেমে গেলেন। পাশের কামরার ধার ঘেঁষে যাবার সময় তাঁর চোখ পড়ল সেই মুশকো লোকটির পানে। কনুইয়ের উপর মাথা রেখে সে যেন কি ভাবছে। কি করে তার কাজ হাসিল করবে তার মৎলব ভাঁজছে নিশ্চয়ই!

লোকটার পাশ দিয়ে যাবার কালে যাতে ওর কর্ণগোচর হয় এমনিতর উঁচু গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ছি—ছিই—ছিঃ!" এইসব অপকর্মদের সম্বন্ধে সমস্ত সভ্যসমাজের ধিক্কারধ্বনি, এক বাক্যে, ঐ একমাত্র চিৎকারে উচ্চারণ করে ওর প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করলেন। লোকটার কানে গিয়ে সেধুলকিনা কে জানে!

তারপর প্রথম শ্রেণীর সামনে এসে দেখলেন সেই ছেলেটি

বিস্মিত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কী ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পেতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একেবারে একান্ত আসন্ন হয়ে এসেছে—এসে পড়ল বলে—যার ধাক্কায়, এমন কি, আশু তার গতাসু হবার পর্যন্ত আশঙ্কা—তার বিন্দুমাত্র ছায়া তার চোখে মুখে নেই। পৃথিবীতে আবার দুষ্কর্মা লোক আছে নাকি? তার অনিষ্ট করতে পারে এমন কেউ আছে নাকি কোথাও! এই ছোট্ট ছেলেটি তা যেন ভাবতেই পারে না। মুশকো লোকটি তার মুখোমুখি এসে পড়লেও ভাবতে পারবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বের বিষয়ে বিস্ময়কর বিশ্বাস তার বিস্মিত চকচকে চোখের চাউনির ভেতর দিয়ে যেন সহস্র ধারায় উছলে পড়ছিল।

হাওড়া-আমতা কাষ্ঠ প্যাসেঞ্জারের গার্ড কোন কথা না বলে ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এলেন।

আসবার সময়ে, সেই মুশকো লোকটির সঙ্গে চোখোচোখি হতে তিনি চোখ পাকিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকালেন। আইনের রক্তচক্ষু যে এখানেও জাগ্রত রয়েছে, এই সংবাদটাই এবার বাঙ্‌নিস্পত্তি না করে কেবল চোখা ভাষায় জানাতে চাইলেন ওকে। জানল কিনা, বুঝল কিনা, এমন কি চোখেও দেখল কিনা, জানা গেল না।

পাতিহাল থেকে গাড়ী ছাড়ল, কোনো অঘটন হোলো না। মুশকো লোকটাও কামরা বদলালো না, গার্ডবাবু তাকিয়ে দেখলেন। দেখে একটু অবাকই হলেন।...তাহলে কি তাঁর রক্তচক্ষুতে কাজ হয়েছে? তিনি যে সবই টের পেয়েছেন লোকটা কি তা বুঝতে পেরেছে তাহলে? ছেলেটা কি এযাত্রা তাঁর পুণ্যবলে তবে বেঁচেই গেল?

পাতিহালের পরের ইষ্টিশন—মুন্সীর হাট। সেখানে ট্রেন পৌঁছতেই মুশকো লোকটা গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। গার্ডবাবু তাঁর কামরার নীচে নেমে খাড়া হলেন। মুশকো লোকটা এখানে

নামল যে? তাহলে কি তার কুমৎলব ত্যাগ করে এখান থেকেই সরে পড়বে নাকি? আঃ, বাঁচা যায় তাহলে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে! গার্ডবাবু লোকটার গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখলেন।

কিন্তু না, লোকটা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল না। বরং ওই গাড়ি ধরা-ছাড়ার মাঝখানের মিনিটখানেক সময়, প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করতে লাগল। ওর কি আরো সঙ্গী সাথী সব এখানে এসে জুটবে না কি? গার্ডবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। আধ মিনিটের মধ্যেই অর্ধেক লোক না উঠতে নামতেই হুইসল্ ফুঁকে তিনি গাড়ি ছাড়বার হুকুম বাজিয়ে দিলেন।

কিন্তু দিলে কি হবে! গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই, গার্ডবাবু নিজের কামরার পাদানিতে পা দিতে না দিতেই সেই দুশমণ লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে একটু আগেই যেমনটি তিনি এসেছিলেন—সেই প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে। আর গাড়িও তখন জোরসে ছেড়ে দিয়েছে।

গার্ডবাবুর মাথা যেন ঘুরতে লাগল। এখন তাঁর কর্তব্য কি? অ্যালার্ম দিয়ে এই দণ্ডেই গাড়ি থামিয়ে লোকটাকে হাতে নাতে পাকড়ানো? কিম্বা বিপদ বুঝলে ছেলেটা নিজেই চেন টেনে গাড়ি থামাবে তার হাপিত্যেসে বসে থাকা? দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাঁর বুক দুর দুর করে।

হাওড়া-আমতা ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু গোলকধাঁধায় পড়ে রইলেন—আর গাড়ি এদিক হাঁসফাঁস করে ধুঁকতে ধুঁকতে আর ক্ষণে ক্ষণে বাঁশী ফুঁকতে ফুঁকতে ছুটে চলল।

মুন্সীরহাট থেকে মাজু—পরের ইষ্টিশন পৌঁছবে পনের মিনিটের পর। এ লাইনেই এধারে এই দুটো ইষ্টিশনের মাঝেই সময়ের ব্যবধান সবচেয়ে বেশী। আর সব ইষ্টিশন পাঁচ মিনিট বাদ বাদ।

মুন্সীরহাট থেকে মাজু—চালাও লম্বা পনের মিনিট। খতিয়ে দেখলে এতটা সময় একটা নাবালকের ক্ষতি বৃদ্ধি করার পক্ষে নিতান্ত কম নয়। হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ির গতিবিধি-হাড়হদ্দ

লোকটার ভালো রকম জানা আছে দেখা যাচ্ছে। যথা সময়ে যথাস্থানে কামরা বদ্‌লে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে, সন্দেহ নেই !

এখন মুন্সীরহাট থেকে মাজু—এর মাঝামাঝি কী ঘটে, কে জানে ! দীর্ঘ পনের মিনিট বাদে পরের ইষ্টিশনে পৌঁছে, ছেলেটাকে বিভিন্ন ভংগ্নাশে বিভক্ত হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে কিনা তাই বা কে বলবে !

হাওড়া-আমতা ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ড অসহায় উত্তেজনায় রুদ্ধ নিশ্বাসে, আশা-আশঙ্কার দোলায় আগাপাশতলা দোদুল্যমান হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছেলে মুক্তচক্ষে বাইরের দিকে তাকিয়ে —তার কোনো হুঁশ নেই। দাদু আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসলেন। নরম গলায় ডাকলেন—"খোকা !"

নাতি চমকে উঠে ফিরে বলল : "একি ? দাদু ! তুমি ? তুমি এখানে ? তুমি এখানে এলে কি করে ?"

"রাগ করিসনে ভাই ! বাড়ি ফিরে চল্ !" দাদুর গদগদ কণ্ঠ।

"না না—কিছুতেই না। প্রাণ থাকতে আমি বাড়ি যাব না।" ছেলেটির সশস্ত্র স্বর : "আমি যুদ্ধে যাবো।"

"উঁহু।" দাদুর মৃদু প্রতিবাদ। "উঁহুহু।"

"যাবই আমি।" নাতির তরফ থেকে আবার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা।

দাদুর মাথা ঘুরে যায়।

"না, যুদ্ধে যায় না ! যুদ্ধে যেতে নেই ! যুদ্ধে আবার যায়— ছিঃ ! যুদ্ধ ভালো নয়।" দাদু তাকে বোঝাতে চান্। "তাছাড়া এরোপ্লেন থেকে অত উঁচু থেকে তুই পড়ে যেতে পারিস !"

"পড়ে যাই যাবো। আমি যাবোই। পড়ে মরে যাই সেও আমার ভালো।" নাতির গলায় বীরত্ব আর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা : "পৃথিবীতে আমার কে আছে ?"

আমার কে আছে—তার মানে? এবার দাতুর রাগ হয়।
এমন জলজ্যান্ত একমাত্র দাতু বেঁচে থাকতে, নাতি বলে কি না—
আমার কে আছে! —এমন ছেলের কী বলে গিয়ে···

নাঃ, আজ সকালের সান্ত্বনাদাতাদের একজন ঠিকই বলেছিল—
ছেলেদের আদর দেয়া কিছু নয়! তাদের মারধোর করে সায়েস্তা
রাখাই উচিত। ভূভারতে আদরণীয় যত রকমের পদার্থ আর
অপদার্থ আছে—ছেলেরা, অন্ততঃ আত্মনেপদী ছেলেরা তার মধ্যে
নয়;—তার অন্যথা করে আদর দিয়ে যথার্থই তিনি ওর মাথাটা
আস্তই চিবিয়েছেন। বেশ, তাহলে সেই পরামর্শদাতাদের নির্দেশ-
মতো ছেলের দুরন্তপনা দূর করতে এখন থেকে তিনি রুদ্রমূর্তি
ধরবেন। পুনরায় আদর দিয়ে আর চর্বিত চর্বণ নয়—এখন থেকে
তাঁর অন্যরূপ। তাঁর অনন্য রূপ।

দেখতে দেখতে তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন, তাঁর চেহারা
থেকে সংহার রূপ ফেটে পড়তে থাকে: "বটে! তোর কে
আছে? কে আছে দেখতে পাচ্ছিস নে? তোর বাবার বাবা
আছে—তার মার মূর্তি দ্যাখ এবার। অ্যাক্ থাপ্পরে দেখিয়ে
দেব নাকি! বাড়ি যাবিনে, বটে! ঘাড় ধরে নিয়ে যাব। দেখি
কে আটকায়—কোন ব্যাটা বাধা দ্যায়! দেখি!"

দাতুর এই অপূর্বতা এই অপরূপ রূপ নাতি এর আগে আর
কখনো দ্যাখেনি! সে হকচকিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে
দাতুর পানে।

নাতিকে ঘাবড়ে যেতে দেখে দাতুর সাহস বাড়ে। টোটকার
ফল দেখে মুষ্টি যোগের উৎসাহ হয়। টোটকা এবং মুষ্টি যোগের
মাঝামাঝি পাচনের মতন একটা কিছু দিয়ে, ফলেন পরিচীয়তেটা
তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান····

হাত বাড়িয়ে নাতির কান ধরে দ্যান এক টান।

এক টান দিতেই ধোঁয়া বেরয়! নাতি চমকে ওঠে একি!
এ আবার কি রকম?—

দাদুর হাতে এহেন অপমান! এ অসহ্য! সে চারিধারে তাকায়—গাড়ির কাঁধে লাগান একটা নোটিশের উপর তার নজর পড়ে যায় হঠাৎ! হাওড়া আমতা রেলোয়ে খুব সম্ভব পরোপকারের জন্য তার মত অপরদের উপকারের লালসাতেই নোটিশখানা যেন ওখানে লটকে রেখেছে। উক্ত রেলের কর্তৃবাচ্য বা কর্মবাচ্যের ভেতরে কেউ হয়ত ভাববাচ্যের বশে কবিত্বপরবশ হয়ে এই কাব্য পরিবেশনের এহেন কাণ্ড করে থাকবেন। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উক্ত নোটিশে লেখা ঃ

থামাতে হলে এ ট্রেন (হাওড়া আমতা বলছেন)
টানো ধরে এই চেন।

এবং সেই সঙ্গে সরল গদ্যে (গদ্য কবিতাই হবে হয়ত) সতর্ক করে দেয়া যে—অকারণে বা অপ্রচুর কারণে উক্ত চেন টানলে তার শাস্তি—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা!

গদ্য রচনার দিকে মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা তখন নাতির নয়।...তাছাড়া তার কানের উপর অত্যাচার হচ্ছে এইটাই কি চেন টানার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়?

অতএব 'থামতে হলে এ ট্রেন, টানো ধরে এই চেন।'—আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাওড়া আমতার এই উপদেশ ছেলেটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বসল।

চেনে হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দাদুর চেহারা বদলে গেল। উথলে ওঠা বীররস মুহূর্তমধ্যে করুণরসে ঘনীভূত হয়ে এল। কাঁদো কাঁদো সুরে তিনি বললেন—"অ্যাঁ, এ কী করলি! কী সর্বনাশ করলি! আমি যে টিকিট কেটে আসিনি রে! বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠে পড়েছি! সময় কি পেলাম টিকিট কাটার। এখন গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যাব যে!"

"তার আমি কি জানি!" নাতি বলল। "আমি—আমি কী জানি তার!" বলতে বলতে ভয় পেয়ে নাতিও থেমে গেল।

ভয় পাবার কারণ সেই চেনটাই।

চেন ছেড়ে দিলেও সে চেন তখনো ঝুলছিল। তার হাত ছাড়া হয়ে তখনো আড়াই হাত ঝুলতে থাকল। একে টেনে ছেড়ে দিলেই আবার তা রবারের মত স্বস্থানে ফিরে গিয়ে আগের রূপ নিয়ে ফের নিজমূর্তি ধারণ করবে এই তার ধারণা ছিল, কিন্তু তার বদলে তার এই ঝোঝুল্যমান দুরবস্থা দেখে, তার হঠকারিতার প্রমাণ দ্বারা হাওড়া আমতা রেলোয়ের না জানি সে কী সর্বনাশ সাধন করেছে যার জন্য গার্ড হয়ত তাকেও কসুর করবে না—সেই আশঙ্কায় নাতিও কাহিল হয়ে পড়ল।

এদিকে গাড়ীও ভস্ করে থেমে গেছে।

"কী হবে দাতু?" নাতি দিশেহারা হয়ে কোথায় যাবে ঠিক না পেয়ে দাতুর বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েঃ "গাড়ী যে থেমে গেল একেবারে?"

দাতুও ঠিক সেই কথা ভাবছিলেন।

"চেন খারাপ করা দেখলে তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না তো?" নাতির আতঙ্কিত কণ্ঠ।

দাতুও প্রায় সেই রকমের কথাই ভাবছিলেন—তবে নাতির ধৃত হওয়া নয়, নিজের উদ্ধৃত হওয়ার সম্ভাবনাটাই তাঁর বেশী ভাবনার কারণ হয়েছিল। চেনের দশার চেয়ে নিজের উপস্থিত দুর্দশাই তাঁকে পীড়িত করছিল বেশী।

"দাতু! দাতু!"···নাতির অসহায় আর্তনাদ।

তাঁর মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি ঝট করে গাড়ীর মেঝেয় দৈর্ঘে প্রস্থে সুবিস্তৃত শুয়ে পড়েন—একদম টান হয়ে।

"আমি ফিট্ হয়ে গেছি! যাই ঘটুক, এই কথা বলবি; আমার মূর্ছা দেখে তুই ভয় খেয়ে গাড়ীর শিকল্ টেনেছিস। বুঝলি?"

'তুমি ফিট হয়ে গেছ আর আমি শেকল টেনেছি! এই তো? বুঝেছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওই কথাটা আঁকড়ে থাকবি; তাহলেই দুদিক-রক্ষা। আমার বিনা টিকিটে গাড়ী চাপা—আর তোর চেন টানা!"

"কিন্তু এই ময়লা মেঝেয় এমন করে লম্বা হলে তোমার কাপড় জামা যে নোংরা হয়ে যাবে দাদু!"

"সে কথা চেন টানার আগে—এই নোংরা কাজ করার আগে ভাবা উচিৎ ছিল। এখন ভেবে লাভ?"

বলতে বলতে তিনি দুই চোখ মুদ্রিত করেন।

চেন টানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গার্ডবাবুর হয়ে গেছল তার হ্যাঁচকা টান কেবল গাড়ীতে নয়, তাঁর নাড়ীতে পর্যন্ত গিয়ে লেগেছিল। এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই হোলো তাহলে এতক্ষণে?

এখন বাকী যেটুকু আছে, তাঁর কর্তব্যের অবশিষ্টাংশ, বদমাশটাকে ধরে-পাকড়ে বেঁধে-ছেঁদে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা—কিন্তু সে কাজ যে কত দুঃসাধ্য, লোকটার হোঁৎকা চেহারা স্মরণে আসতেই তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল। দুরুদুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে নিজের কামরা থেকে তিনি নামলেন।

কামরার পর কামরা পার হয়ে যাবার সময় তাঁর মনে হলো, অমন একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডাকে একলা কি তিনি কাবু করতে পারবেন? যতই তিনি প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগুতে থাকলেন, জিজ্ঞাসার চিহ্নটা ততই বৃহত্তর হয়ে তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। ওরকম দুঃসাধ্য ক্রিয়ার কর্তারূপে কোনোদিন দুঃস্বপ্নেও তো নিজেকে তিনি কল্পনা করেননি।

তাঁর একটা ভরসা ছিল, গাড়ীর ড্রাইভারও ওদিক থেকে এগিয়ে এসে তাঁর সহযোগিতা করবে, এবং সে লোকটা একটু ষণ্ডাগোছের—গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে জব্দ করতে একটু অদ্বিতীয়ই বইকি! কিন্তু না, বৃথাই দুরাশা! ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনের গহ্বর থেকে তার

চমৎকৃত মুখখানা বার করে তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু নামবার কোনো দুর্লক্ষণ তার দেখা গেল না।

আর হাওড়া-আমতা যাত্রীদের কথা যদি বলতে হয়, তারা মুখ বাড়ানোর কষ্টটুকু পর্যন্ত করেনি। চেন টানা পড়ার জন্যই যে গাড়ী আটকা পড়েছে, এ হেন কল্পনা, সন্দেহসূত্রেও তাদের মনে স্থান পায়নি—তারা ভেবেছে, এ লাইনের যেমন রেওয়াজ—নিত্যকার টানাপোড়েন! হাওড়া-আমতার গাড়ি চলতে চলতে থেমে যায়, থামতে থামতে চলে—যখন যেমন খেয়াল—এই তার চিরদিনের দস্তুর ; এ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে গেছে ?

অগত্যা ফাসট্ প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবুকে নিঃসঙ্গই এগুতে হোলো। কর্তব্যের আহ্বান—কি করবেন? নিজের বাহুবল সম্বল করে স্খলিত পায়ে একাই তিনি এগুতে লাগলেন।

হাতল ধরে উঠে কামরাটার ভিতরে উঁকি মারতেই তাঁর চক্ষু-স্থির! পা ফসকে পা-দানি থেকে খসে পড়েন আর কি!

সেই ছেলেটি গাড়ির দরজার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, খাড়া দাঁড়ানো। আর সেই হোঁৎকা লোকটা তার পায়ের কাছে চোদ্দ পোয়া। এক ঘুষিতে অমন জোয়ানকে লম্বা শুইয়ে দিয়েছে! অ্যাঁ? কী ছেলে সব আজকালকার? অদ্ভুত!

এহেন দৃশ্যের পর কামরার অভ্যন্তরে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করতে আর কোনো বাধা রইল না—কোনো দ্বিধাও নয়—তাঁর সাহসও যথেষ্ট বেড়ে গেল। তিনি সবলহস্তে খট্ করে দরজা খুলে ঘটা করে ভেতরে পদার্পণ করলেন।

ছেলেটি পিছন ফিরল।

"এই যে গার্ডবাবু!" বলল ছেলেটিঃ "এই লোকটি, এই ভদ্রলোকটি হঠাৎ ফিট হয়ে গেছেন—আমি কি করব ভেবে না পেয়ে, ঠিক করতে না পেরে আপনার চেন টেনে ফেলেছি।"

গার্ডবাবু ঝুঁকে পড়ে চিৎপটাং লোকটার বুকের উপর কান

পাতলেন। নাঃ, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিদ হয়নি, বেশ ভুমদাম আওয়াজ হচ্ছে। নাড়ী টিপে দেখলেন, তুপদাপ চলছে।

"ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। তেমন কিছু জখম হয়নি। মারা যাবার কোনো লক্ষণ নেই।" ছেলেটিকে তিনি আশ্বাস দিতে চাইলেন ঃ "বেঁচেই আছে।"

"বেঁচে আছে? আঃ, তবু ভালো!" ছেলেটির যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

"কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে তুমি! কি দিয়ে বসালে লোকটাকে বলো তো?"

"আমি! আমি তো বসাই নি। আমি কি দিয়ে বসাবো।" ছেলেটি ভয়ানক বিস্মিত ঃ "আমি ওঁকে মারি-টারিনি। মারবো কেন? এমনিতেই উনি গোঁ গোঁ করে উলটে পড়লেন। আমি সত্যি বলছি আপনাকে।"

"বলতে হবে না, বলতে হবে না।" গার্ডবাবু বাধা দিয়ে বলেন ঃ "তুমি মিথ্যে ভয় খাচ্ছো খোকা—ভয়ের কিছু নেই। আত্মরক্ষার খাতিরে আততায়ীকে আঘাত করবার ন্যায্য অধিকার তোমার রয়েছে। আইনতঃ অধিকার। মেরেছ, বেশ করেছ। তাতে কি?"

"কিন্তু—কিন্তু—আমি মারিনি তো! এই লোকটি—এই ভদ্রলোকটি—আমার একজন বন্ধু ইনি।"

"বন্ধু! হ্যাঁ বন্ধুই বটে!" মনে মনে আওড়ালেন গার্ডবাবু 'বন্ধু আর বলে কাকে!' থানা পুলিসের ভয়ে ছেলেটি চেপে যাচ্ছে, বুঝতে তাঁর বাকী ছিল না।

'কেয়া গার্ডসাহেব—কেয়া হুয়া?' এতক্ষণ পরে হাওড়া-আমতা ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের ড্রাইভারও গার্ডের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

"এই লোকটা, এই ছেলেটিকে আক্রমণ করেছিল। ছেলেটি তাকে—এক ঘুষিতে—ঘুষি কি যুযুৎসুর প্যাঁচ, কে জানে! তার চোটে

একদম বেহুঁস করে দিয়েছে। আর এখন ও বলছে, এই বদমাস লোকটা নাকি ওর বন্ধু!"

"সত্যি বলছি আমার বন্ধু!" ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়: "হাওড়া থেকে একসঙ্গে এসেছি আমরা।"

"এই খানেই গোলমাল হে ড্রাইভার, এই খানেই গোলমাল! ও বলছে, ওরা একসঙ্গে আছে। অথচ আমি নিজে দেখেছি, এই ছেলেটি উঠেছে কদমতলায়; আর ওই লোকটা উঠল বড়গাছিয়ায়। তাও এ কামরায় নয় অন্য কামরায়। লোকটা কামরা বদলেছে; আমার নিজের চোখে দেখা—এই কেবল আগের ষ্টেশনে। এখন এথেকে কি বুঝবে, বোঝো।"

"হামি বুঝতে পারছে।" ড্রাইভার আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়েঃ "হুম, আদমিটাকে দেখলেই বুঝা যায়।"

"কি বুঝা যায় শুনি?" ছেলেটির এবার রাগ হয়ে গেছে।

"সেই ধরনের আদমিই বটে।" ড্রাইভারের গরুগম্ভীর মুখঃ "হুম, মালুম হয় বেশ।"

"মোটেই সেই ধরনের না। আমি স্পষ্ট বলছি আপনাদের।" ছেলেটি গর্জন করে ওঠেঃ "ইনি আমার দাদু।"

"ছিঃ অজানা অচেনা লোককে দাদু বলে না। পরের দাদুকে দাদু বলতে নেই, খোকা!"

"বাঃ, আমার নিজের দাদুকে বলব না? বা রে!"

"এই মাত্র তুমি বল্লে আমার বন্ধু আর এখন বলছ কিনা— দাদু। এটা কি ভালো করছ বাপু?"

"কেন দাদু হলে কি বন্ধু হয় না?" ছেলেটিও পেছোবার নয়। "দাদুর মতো বন্ধু আবার কে আছে?"

"অমৃতং বালভাষিতং?" এই বলে গার্ডবাবু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

"ওসব বাৎ ছোড় দেও। আভি কেয়া করনা হ্যায় উওতো বাৎলাও?" ড্রাইভারের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা।

"লোকটাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে পুলিসের হাতে গছিয়ে দেয়া। তাছাড়া আর কি ?" গার্ডবাবুর সাফ্ জবাব।

তারপর গার্ড আর ড্রাইভার, দুজনে মিলে ধরাধরি করে, ধরাশায়ীকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে, লাইনের ধারে ঘাসের উপরে নিয়ে এসে ভূমিসাৎ করল।

"এখন আমাদের পহেলা কাম হচ্ছে—" ড্রাইভারের ফয়সলা শোনা যায়ঃ "আগে লোকটার হুঁস ফিরানো। তারপর উসকো জিগাস করা ইসকা মৎলব কেয়া ? তুমি দাঁড়াও, আমি আভি আসছে। এর ভিতর যদিও উঠে পড়ে, কি ভাগবার মৎলব করে, কি আউর কিছু গড় বড় লাগায় অমনি তুমি ভালো রকম এক ঘা বসিয়ে ফিন উসকো বেহুঁস বানিয়ে দেবে, সমঝেছ ?'

এই বলে রহস্যময় একটা ইঙ্গিত হেনে ড্রাইভার ইঞ্জিনের দিকে রপ্তানি হয়ে গেল।

ইতি মধ্যে হাওড়া-আমতার টনক নড়েছে ; অঘটন কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়, তারা তার আঁচ পেয়েছে যেন। যাত্রীরা একে একে নামতে শুরু করেছিল। তারা সবাই এসে 'ওয়েল গার্ডেড' অচৈতন্য লোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। এবং গার্ডবাবুও ছেলেটির সঙ্গে লোকটার ঘোরতর সংঘর্ষের রোমাঞ্চকর কাহিনীকে যতদূর সাধ্য আরো ফলাও করে তাদের প্রাণে বিভীষিকা সঞ্চারের চেষ্টায় লাগলেন।

ছোট্ট ছেলের উপর রাহাজানি! হাওড়া-আমতার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তাদের ফিসফাস্ ক্রমে জোরালো এবং আরো ঘোরালো হতে লাগল—বিরক্তিও কূল ছাপিয়ে গেল। প্রত্যেক মুখপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রায় এক রকমের দেখা গেল—লোকটিকে উচিৎমতো শিক্ষা দেওয়া দরকার—উত্তম মধ্যম একখানা শিক্ষা।

কিন্তু এখনই ওর এই অবস্থাতেই ওর এই দুরবস্থার সুযোগে উক্ত শিক্ষা দিতে শুরু করলে কেমন হয়? উচিত এবং ঠিক বীরোচিত হয় কিনা এই নিয়েই যা বাদানুবাদ চলছিল তাদের মধ্যে। শিক্ষণীয় এই দণ্ডে লোকটা শিক্ষা নেবার সঠিক উপযুক্ত কি না; এই বিতর্কে একমত হতেই যা ওদের বাধছিল।

নাতি দেখল, সর্বনাশ! কাণ্ডজ্ঞানহীন জনসাধারণ ক্ষেপে গেলে কি না হতে পারে!—খবরের কাগজে তেমন কাণ্ড কখনো পড়েনি যে তা নয়। আর দেরী করলে, দাদুকে আস্তানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ত দূরের কথা; আস্ত রাখাই কঠিন হবে।

"শুনুন মশাই! শুনুন আপনারা—" নাতি বলতে শুরু করল: "আসল কথা শুনুন আমার কাছে। আপনারা ভুল করছেন ভয়ানক! এই ভদ্রলোক আমার দাদু, আমার নিজের দাদু এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ সকলে আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। আমি বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলাম—এই হাওড়া-আমতার গাড়ি চেপে সট্‌কান দিচ্ছিলাম সটান। সোজাসুজি বোম্বাই! দাদু টের পেয়ে আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এসেছেন। কামরাতে ঢুকেই আমাকে দেখে উনি ফিট্ হয়ে গেছেন। যাকে বলে পতন এবং মূর্ছা। কিম্বা মূর্ছা এবং পতন তাও বলতে পারেন। এই হোলো আসল ঘটনা। যা সত্যি কথা তাই বলছি আপনাদের। এর একটি বর্ণ মিথ্যে না। এক বিন্দু বানানো নয়।"

এতদূর বলে ছেলেটি থামল।

ছেলেটির স্বীকারোক্তির সরলতা, সবলতা আর সাবলীলতা, আস্তে আস্তে হাওড়া-আমতার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পায়। হ্যাঁ, এ হাওয়া সম্ভব। এ রকমও হতে পারে, খুবই হতে পারে। ছেলেরা কি বাড়ি থেকে পালায় না? আখচার পালাচ্ছে। আর দাদুরা খবর পেয়ে যে পেছনে তাড়া করে আসবে—সে আর বিচিত্র কি?

তাহলে এই অধঃপতিত ভদ্রলোক একজন পৌত্রবৎসল দাদু মাত্র! হাওয়ার গতি ফিরে যায়। হাওড়ার মতি গতি ফেরে।

হাওড়া আমতার মন টলে। জনমত বদলায়। সমবেত জনতা লোকটার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হতে থাকে।

পালে পার্বণে সহপাঠীদের থিয়েটারে অভিনয় করা নাতির রপ্ত ছিল। অডিয়েন্সকে কি করে গলাতে হয় তার এক আধটু অভিজ্ঞতা তার ছিল না যে তা নয়। মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝে দর্শকদের গদগদ করে দেবার এক ব্রহ্মাস্ত্র সে ছাড়ল এবার। স্বামী বিবেকানন্দের কায়দায়, দুহাত কোষবদ্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে নত মুখে সে বল্ল ঃ

"দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা—আমি দাদুর—আমার স্নেহময় পিতামহের আমি এক নরাধম পৌত্র।"

দাদুর ঠোঁটের কোণে হাসির চমক খেলে গেল। মুহূর্তের জন্যই কেবল।

শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে ওঠে – এযে আস্ত একখানা নাটক দেখা যাচ্ছে! থিয়েটারের বাইরে এরকম একটা দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হাওড়া-আমতার কল্পনাতেও ছিল না। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত তাদের নাট্যবোধের সূক্ষ্মতায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

এবার দাদুর অর্ধোদয় যোগ এল। তাঁর নিজের পার্ট করবার পালা এল এখন। আস্তে আস্তে তিনি চোখ খুললেন।

"আমি? আমি কোথায়?" ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন। এ-রকম অবস্থায় যে রকম করা দস্তুর, চিরাচরিত প্রথা যা, নিত্যকাল ধরে মর্তলোকে যা বরাবর হয়ে আসছে তাই করাই তিনি সমীচীন বোধ করলেন।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে নিজেকে তিনি তুললেন ঃ "বৎস! পৌত্র আমার! অবোধ নাতি আমার—"

বলতে বলতে ফের তিনি পড়ে গেলেন। আবার তাঁর দুচোখে বুজে এল।

নাটক জমে উঠেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য চমকদার দৃশ্য সব— একটার পর একটা উদ্ঘাটিত হচ্ছে, অবলীলাক্রমে হয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবেই চমৎকার চলত যদি না নিরুদ্দিষ্ট ড্রাইভারটি রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে অবতীর্ণ হয়ে বিচ্ছিরি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন।

লোকটার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য তিনি জলের সন্ধানে গেছলেন। তাঁর ইঞ্জিনের জল টগবগে গরম—সেই ফুটন্ত জল বদলোকদের চৈতন্য-সঞ্চারের জন্য যথোচিত হলেও ঠিক সেই ধরনের চৈতন্যদান করা তখন তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি কয়লার বালতিটা করে পাশের ডোবা থেকে জল কুড়িয়ে এনেছেন। সেই ঘোলা জলে কাদার ভাগই বেশী, পানারও অভাব নেই, আর প্রচুর ব্যাঙাচি! তা ছাড়া, বালতির তলার দিকে কয়লার গুঁড়োর পুরু একটা পলস্তারা জমাছিল।

এই ধরনের জলযোগে জ্ঞান ফেরানো চৈতন্যলাভকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হবে কিনা, এসব খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবার সময় তাঁর ছিল না। তা ছাড়া, এজাতীয় মার্জিত রুচির কথা ভাববার মতো মেজাজও তাঁর নেই তখন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রথম লোকটার চৈতন্য-সম্পাদন করা, তারপরে প্রশ্ন করা, এ সবের মানে কি? এবং সে মানে যদি মানানসই না হয় তাহলে তারপরে পুনরায় অন্যধরনের তার চৈতন্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা (চাই কি সেই চেষ্টায় পুনরায় যদি তার চৈতন্যলোপ হয় তাতেও তিনি পেছপা নন)।

বালতি হাতে গটমট্ করে তিনি জনতা ভেদ করে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে জনমত যে একেবারে বদলে গেছে, এ বিষয়ে কেউ তাঁকে কিছু বলবার আগেই কাদাটে-পানাটে সেই এক বালতি জল তিনি ভূপতিত সেই লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে খালাস করে দিয়েছেন।

এর ফলে চৈতন্য-সম্পাদন না হয়ে যায় না! দাহুকে উঠে বসতে হোলো। পানাগুলো তাঁর চুলে জড়িয়েছে, গাল বেয়ে

কয়লা আর কাদা গড়িয়ে পড়ছে, আর ব্যাঙাচিরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে তার কোলের উপর নাচানাচি লাগিয়ে দিয়েছে।

"দাদু! দাদু!" নাতি চেঁচিয়ে উঠে দাদুর কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমার জন্যেই তোমার এত দুর্দশা!" দুহাত দিয়ে সে দাদুর দেহ থেকে পানা আর ময়লা, ময়লা আর ব্যাঙাচিদের সরাতে লাগল।

একজন নির্দোষ ভদ্রলোকের প্রতি এ কিরকম দুর্ব্যবহার! হাওড়া-আমতার যাত্রীরা এবার ড্রাইভারের উপর রুখে দাঁড়াল: "এরকম করার মানে? মৎলব কি এর....শুনি?"—সবাই জানতে চাইল একবাক্যে।

যে প্রশ্ন তিনিই নাকি সদ্যচেতন লোকটিকে করতে যাবেন, অবিকল সেই প্রশ্নটি তাঁর প্রতি প্রক্ষিপ্ত হতে দেখে, ড্রাইভারের মেজাজ বিগড়ে গেল।

"মানে টানে হামি জানে না। এক-দুই-তিন বলতে না বলতে তুমি লোক এই গাড়ীতে এসে উঠলে তো উঠলে! নইলে সোজা হামি এই খালি গাড়ি লিয়েই সটাং মাজু চলে যাবে—হুম্!"

চড়া গলায় হুকুম করেই তিনি নিজের এঞ্জিনে গিয়ে চড়াও হলেন।

এবং হাওড়া-আমতার লোকেরাও বিজাতীয় বিরক্তি বিস্মৃত হয়ে, উচ্ছ্বসিত বিদ্বেষ ভুলে, কঠোর যত মতামত তখনকার মত মুলতুবি রেখে, পড়ি কি মরি করে এক দৌড়ে গিয়ে নিজের জায়গা দখল করে বসল।

নাতি তখন দাদুর পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত এবং দাদুও নাতির স্নেহের বহরে এমন মশগুল যে, ইতিমধ্যে কখন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য বদলে সম্পূর্ণ পট পরিবর্তন হয়ে গেছে, দুজনের কারো সেদিকে নজরই পড়ল না।

ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু গাড়ীর পাদানিতে দাঁড়িয়ে পতাকা

ওড়ালেন কিন্তু দাদুনাতির কারো সেদিকে চোখ ছিল না। ড্রাইভার এঞ্জিনের সানাই ফুঁকে দিল, তার তীব্র আওয়াজেও কোনো কাজ হল না। অগত্যা গার্ডবাবু তাদের কাছে গিয়ে বার দুই কাশলেন, গলা খাকারি দিলেন, খুটখাট করলেন কিন্তু কিছুতেই কোনো সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে আমতা আমতা করে বলতে বাধ্য হলেন—“শুনচেন মশায়, আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে—”

কিন্তু কে কার কথা শোনে! হারানো পৌত্ররত্নকে ফিরে পেয়ে দাদুর তখন কোনোদিকেই খেয়াল নেই।

“দাদু, আমি আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না ….” নাতি বলছিল।

দাদুর সারা মুখে কৃতার্থতা।

“আর কখনো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।”

দাদুর বত্রিশ পাটিতে বিজয় উল্লাস।

“মাপ করবেন, আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা দয়া করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন!” গার্ডবাবু মাঝখান থেকে বলতে যান।

কিন্তু কে তাঁর কথায় কান দেয়, নাতির কথামৃতে দাদুর কান জোড়া তখন, অন্য কথায় কর্ণপাত করার ফাঁক কই তাঁর?

“আর কখনো আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব না।” নাতি বলে।

দাদুর দুই চোখে আনন্দের দীপ্তি।

“চ খোকা, আর দেরী করে না, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—দেখছিসনে!”

বলতে বলতে দাদুর হুঁস হয়ঃ “এক্ষুনি হয়ত ছেড়ে দেবে। দেরী করলে আমাদের ফেলে রেখেই চলে যাবে হয়ত।”

ধূমায়মান গাড়ির দিকে তাকাতেই যেন তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। নন্দন-কানন থেকে দাদুর পদস্খলন হয়—আবার তিনি ধরিত্রীতে পদার্পণ করেন।

পৃথিবীর মাটিতে পা পড়তেই তিনি উঠে পড়েন, উঠে পড়েই গাড়ির দিকে ছুট লাগান, নাতিও চটপট তাঁর পিছু নেয়।

হাওড়া-আমতা ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু পতাকা হাতে অনেকটা যেন অদৃশ্য মানুষের মতই, তাদের পেছনে পেছনে আসতে থাকেন। পতাকা ওড়াবার কথা তিনি ভুলেই গেছেন তখন !

সেদিন রাতে দাদু-নাতিতে কথা হ'ল সকালে কে কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে। ঘুম ভেঙ্গে গেলেও কেউ চোখ খুলতে পারবে না। টুসি বলল—চোখ খুললেই সে বাজিতে হারবে আর তাকে তখন খেসারৎ দিতে হবে।

দাদুই কথাটা সমাপ্ত করে দেয়। "ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি যদি বাজিতে হারি তাহলে তোকে একটা সেফার কলম কিনে দেব। আর তুই হারলে আমাকে কি দিবি ? না না তুই কোথা পাবি ? তার চেয়ে বরং তুই গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে দুপুরের লাঞ্চের একটা সিট রিজার্ভ করে আসবি।"

সকাল আটটা বেজে গেল - দু'জনে তবুও ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে না চোখ বুজে পড়ে আছে। টুসি তো সেই ভোর থেকে উসখুস করছে। তবুও চোখ মেলতে সাহস করছে না। যদি আগে সে চায় তাহলে দাদুর দেয়া সেফার কলমটি লাভ হবে না। কলমটা তো সেদিন রাত্রে পার্কের হাঁড়িকাঠে পড়ে এক মিষ্টিভাষী লোক হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কলমটা ছিল পার্কার এখন দাদু দেবে সেফার। না, কোনমতেই সে চোখ খুলবে না যত খিদে তার পাক না কেন ! টুসি শুয়ে শুয়ে ভাবছে এই কথা আর মিটমিট করে দাদুর দিকে তাকাচ্ছে।

এদিকে টুসির দাদুর তন্দ্রা কখন টুটে গেছে। উঠবার ইচ্ছা থাকলেও উঠতে পারছে না তাহলে বাজিতে হারতে হবে। চোখ দুটো শক্ত করে বুজে রাখল।

ঘুম না থাকলে এভাবে কতক্ষণ থাকা যায়। টুসির দাদুর মনে হচ্ছে এভাবে বাজি ধরা ঠিক হয়নি। যা তা কথা মনে আসছে—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা সম্ভব কি না! এমন যদি হয় রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন না চলে প্ল্যাটফরমটাই যদি লাইনের ওপর দিয়ে চলে তাহলে কি মজাই না হয়! তাহলে প্ল্যাটফরমে থেকে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিল্লী মক্কায় চলে যাওয়া যায়।

আরো ভাবছে এখন তো সকাল আটটা বেজে গেছে চোখে না দেখলেও ঘড়ির শব্দ কানে শুনে তিনি ঠিক করে নিয়েছেন। আহা! এসময় দুটো ডিমের পোচ, মাখন লাগানো রুটি আর বড় এক গেলাস হরলিক্স কি উপাদেয়! সকালের ব্রেকফাষ্টের কথা ভেবে তার মন আরো মুষড়ে পড়ল যেন। কিন্তু উপায় কি! চোখ খুলে উঠে বসলে টুসিটা জিতে যাবে আর এখুনিই তার করকরে ৬০ টাকা খসবে।

এমন সময় একটা বিপর্যয় ঘটল।

টুসির দাদু চেঁচিয়ে উঠল—"ওরে ও টুসি! এত ঘুম কিসের! আমার কথা কানে যাচ্ছে না?"

টুসি বলে। "কি হয়েছে বলবে তো? না বললে শুনবোই বা কি করে?"

"আমার ভুঁড়িটা যে হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে। ভুঁড়ির ওপর একটা ভার বোধ করছি। তুই উঠে দেখনা কি হ'ল?"

টুসি দাদুর মতলব বুঝতে পারে। এই ফাঁকে দাদু তাকে চোখ মেলতে বলছে। দাদুর জিত হবে আর টুসির হার হবে।

চোখ না খুলেই টুসি উত্তর দেয়—"ও কিছু নয় দাদু? তোমার পেটের পিলে নড়াচড়া করছে। তুমি তো এক ডিসপেনসারী ওষুধ খেয়েছ। নানা ওষুধের গুণে তাই পিলে কক্ষচ্যুত হয়ে পেটের মধ্যে ভ্রমণ করছে।"

টুসি দাদুকে সান্ত্বনা দেয়।

আবার চীৎকার শোনা যায় টুসির দাতুর। "ওরে বাবারে! আমার ভুঁড়ির ওপর কি যেন লাফালাফি করছে।"

টুসি আর থাকতে পারল না। সে যে বাজিতে হারবে সে কথাও সে ভুলে গেল। দাতুর একটা কিছু হলে তাকেই তো ভুগতে হবে। দরকার নেই চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে। এভাবে মানুষ আর কতক্ষণ থাকতে পারে।

টুসি ধড়মড় করে উঠে সটান চোখ মেলল। আর কি আশ্চর্য ঠিক সেই সময় দাতুও চোখ খুলেছে। তুজনে প্রায় একসঙ্গেই বলতে হয়। তুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল বৈকি। অতএব বাজি ড্র হয়ে গেল।

তুজনেই ভাবতে লাগল এখন তাহলে কি হবে? এরকম হবে তা তো আগে থেকে জানা ছিল না। ড্র হবে জানলে টুসি সেদিন দাতুর সঙ্গে একটা রফা করে নিত। খেলায় যেমন হারজিত আছে বাজি ধরতেও তেমন হারজিত আছে। কিন্তু ড্র হলে কি হয় তা টুসির জানা ছিল না।

মিঁয়াও—

মিঁয়াও শব্দে টুসি চমকে উঠল। দাতুর খাটের বালিশের ওপর তাদেব রূপী বেড়ালটা বসে আছে। তার দাতুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে বেড়ালটা দাতুকে কিছু বলতে চায়।

বেড়ালটাকে দেখে টুসি বলে উঠল। "দাতু, ঐ রূপীটাই তোমার ভুঁড়ির ওপর দাপাদাপি করছিল। তোমার চোখ খোলা থাকলে দেখতে পেতে।

টুসি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার দাতুর ততক্ষণ ব্রেক-ফাষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। কথা বলার সময়ই নেই।

"ওরে আরো তুটো ডিমের অমলেট নিয়ে আয়। না থাকে চট করে বাজারে যা। যাবি আর আসবি—আসবি আর যাবি। কোথাও দাঁড়াস না যেন! এতক্ষণ চোখ বুজে থেকে যা ক্ষিদে পেয়েছে দাঁড়াতে পারছিনা।

দাতু বাজখাঁই গলায় নীচে চাকরটাকে ডেকে বলল।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হলে দাদুর তিরিক্ষি মেজাজ একটু শান্ত হয়। এবার টুসির কথায় জবাব দেয়।

"বলি, হয়েছে কি? ও বেড়াল বলে কি মানুষের মত নয়? ওরো তো ক্ষিদে তেষ্টা আছে। তাই নয় কি?"

বুঝেছি দাদু, "তাই ওটা তোমার ভুঁড়ির ওপর বসে তোমাকে ব্রেকফাষ্টের কথা জানাতে এসেছে।" টুসি বলে—"সকাল আটটা বেজে গেল তবুও তুমি উঠছো না দেখে ওর ঐ তাড়া। তোমার সঙ্গে ওর ও তো ব্রেকফাষ্ট হবে।"

"দেখ, জীবে সব সময় দয়া দেখাবি"—দাদু বলে। শুনিসনি

"জীবে দয়া দেখায় যেজন
সেজন সেবিছে ঈশ্বর।"

ব্রেকফাষ্ট করে দাদু তো শান্ত হল কিন্তু টুসি যে এখনো পর্যন্ত কিছু খায়নি তা যেন দাদুর মনে নেই। একবার বলল না টুসি ব্রেকফাষ্ট করে আয়।

তাই টুসিকে বেশ অসুখী দেখায়। মুখ ভার করে দাড়িয়ে থাকে।

দাদু টুসির সে ভাব লক্ষ্য করে বলল, "ওতো মুখ ভার করে আছিস কেন? বাজিতে ড্র হয়েছে তো কি হয়েছে? সব কাজে সব সময় যদি ড্র হয় তাহলে দেখবি ঝগড়াঝাটি, পেটাপিটি আর থাকবে না।"

দাদুর কথা শুনে টসি মুখ ভার করেই বলে, "আমি ওসব কথা ভাবছি না দাদু। আজ আমাদের স্কুলের মাঠে স্পোর্টস্ এর হিট হবে। সকাল নটার মধ্যে সব ছেলেকে সেখানে হাজির হতে হবে। ওখানে রোল কল করবে হেড স্যার নিজেই। কোন ছেলে হাজির না হলে তার ৫ টাকা জরিমানা হবে।"

"যাবি তো যা না, এখনো তো নটা বাজেনি।"

টুসি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"স্পোর্টসে গেলে তোর কটা-হাত বেরুবে শুনি।" দাদু ধমকে ওঠে।

"স্পোর্টস্, স্পোর্টস্ করছিস কিন্তু স্পোর্টস্ কাকে বলে জানিস? তোদের স্পোর্টস্ তো একটা পার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্পোর্টস্ ছিল আমাদের কালে। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, নৌকো নিয়ে বাইচ খেলা, তেপান্তর মাঠ পার হওয়া এমন সব স্পোর্টস্।" দাদুর আগের কথা যেন মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহও বেড়ে চলে।

টুসির এসব কথা আদৌ ভাল লাগছিল না। তার মন পড়ে আছে স্কুলের মাঠের দিকে। কাল স্কুলে যেয়ে সে সকলকে কি বলবে? স্কুলের ছেলেদের মধ্যে তাকেই একমাত্র জরিমানা দিতে হবে। স্কুলের দারোয়ান যখন জরিমানার নোটিশ তার কাছে সই করতে আনবে তখন ক্লাশের সব ছেলে তাকিয়ে দেখবে আর লজ্জায় তার মাথা হেঁট হবে।

এসব হবে তার দাদুর জন্যেই। দাদুর জন্যেই কাল স্কুলে সব ছেলেরাই তার দিকে তাকিয়ে দেখবে। দাদু তো এসব কথা বুঝবে না। বুঝিয়ে বললেও শুনবে না। একেবারে যাকে বলে নাছোড়বান্দা।

দাদু নাতিকে খুশী করতে এবার অন্য কথা পাড়ে।

"দেখ, আমাদের বাজিতে যখন ড্র হয়ে গেছে তখন একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমাদের সময়ে কোন কিছুতে ড্র হলে আমরা তাই করতাম। ঝগড়াঝাটি হতো না, মারপিটও হতো না। কথায় বলে নিজে ভাল হলে সকলকেই ভাল দেখবে। শুনিসনি কথাটা।" দাদু গদগদ হয়ে বলতে থাকে।

"আমাদের বাজি ধরা ছিল যে তুই জিতলে আমি তোকে একটা সেফার কলম কিনে দেব। আমি জানি তোর একটা ভাল কলম দরকার। লেখাপড়া করতে হলে কলম না হলে চলে না। আমাদের কালে ফাউনটেন পেনের বালাই ছিল না। তা যাক, তোর কথা ছিল আমি জিতলে তুই গ্রাণ্ড হোটেলে আমার লাঞ্চের ব্যবস্থা করে আসবি। লাঞ্চের খরচটা অবশ্য আমিই তোকে দেব।"

টুসি দাতুর দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঐ কথাই তো ছিল। কি হবে তাতে?"

টুসি বেশ কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে।

"আমার ছেলেবেলার তুজন বন্ধু আছে। বন্ধু বল্লে ভুল হয় তারা আমার যমজ ভাইয়ের মত। একজনের নাম প্রাণকেষ্ট আর একজনের নাম ধিনিকেষ্ট। প্রাণকেষ্টর একটা কলম মেরামতের দোকান আছে। চৌরঙ্গীর কাছে বোধ হয়। তাছাড়া হাতাই করা অনেক রকম কলমও সে রাখে। শুনেছি সারা কলকাতায় যত সব কলম হাতাই হয় সবই ঐ দোকানে যায়। প্রাণকেষ্ট এতেই তু'পয়সা পায়। কলম মেরামত করে আর কত হয় তার। তোর যা ইচ্ছা কলম সেই দোকানে পাবি।"

"আর ধিনিকেষ্টর একটা আধুনিক রেঁস্তরা আছে। নাম শুনেছি 'কাফে ডি ম্যাডাম'। প্রাণকেষ্টর দোকানের কাছাকাছি জানি। নাম শুনে মনে করেছিলুম বড় বড় মেমসাহেবরাই বোধ হয় ওখানে খেতে যায়। কিন্তু তা নয়। মেমসাহেবদের যত সব আয়া আর বাবুর্চি ঐ রেঁস্তরায় ভিড় জমিয়ে থাকে। শুনেছি মগ কুক রান্না করে আর খাবারও রকম রকম হয়।"

টুসি এবার অস্থির হয়ে ওঠে। দাতুর হাত থেকে সে এখন নিস্তার পেতে চায়।

দাতু তো একটু থেমেই আবার বলে।

"বেশ তো চল্ না ঐ প্রাণকেষ্টর দোকানে। হাতাই করা যে কলমটা তোর ভাল লাগবে তাই নিবি। দামও বেশ সস্তা হবে। চাইকি প্রাণকেষ্ট হয়তো তোকে ওটা প্রেজেণ্ট করতেও পারে। প্রেজেণ্ট করলেও তার গায়ে লাগবে না। এমন অনেক জিনিস সে বিনা-মূল্যেই পায়। কলম কেনা হলে চল যাই ঐ কাফে ডি ম্যাডামে। তোকে খেতে হবে না আমি যত রকম খাবার আছে একটু একটু করে চেকে দেখব। ভাল না লাগলে কাছাকাছি অন্য রেঁস্তরা তো আছে। সেখানেই না হয় চলে যাব আর তুই বাড়ী ফিরে আসবি। ড্র হলে কেমন বিধান দিতে হয় দেখলি তো?"

দাদু নাতিতে এবংবিধ কথা হচ্ছিল।

চলতো বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ।

এমন সময় দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীওয়ালার হেঁড়ে গলায় চীৎকার।

"ও মশাই, এখনো কি ঘুমিয়ে আছেন? সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন? সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে।

টুসি ওপর থেকে উত্তর দেয়, "কেন আমরা তো জেগেই আছি। এখন নটা বেজে দশ। এখনো লোক ঘুমিয়ে থাকে নাকি? আপনার কি দরকার – ওপরে আসুন। দাদুর বাতের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে তাই নামতে পারবে না।"

বাড়ীওয়ালা সটান ওপরে এসে একটা চেয়ায় দখল করে বসল। দাদুর দিকে চেয়ে বলল, "মশাই, আছেন কেমন? প্রায় এক পক্ষকাল আপনার খবর নিতে পারিনি। বোঝেন তো বুড়ো বয়সে ডিসপেপসিয়া হলে কি জ্বালা। ডাক্তারের নির্দেশে সাত দিনের জন্য একটু হাওয়া বদলাতে গেছলুম।" বাড়ীওয়ালা না থেমেই বলে যায়।

"আরো কি মুস্কিল জানেন। ডাক্তার তো নির্দেশ দিয়েই খালাস। বলে আপনাকে রোজ পরিশ্রম করতে হবে। এই বয়সে কি পরিশ্রমের কাজ করব? বাজার যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু পরিশ্রমের কাজ দেখি না। তাও আবার আজকাল ছোট নাতিটা বাজার করছে। বাজারের পয়সা থেকে দু'চারটা পয়সা হাতিয়ে নেওয়া তার অভ্যাস আছে জেনেও তাকে এই কাজটি ছেড়ে দিতে হয়েছে।

"তাহলে আপনি এখন কি পরিশ্রমের কাজ করছেন।"

"ও সে কথাই বলতে এসেছি। তাছাড়া আরো একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে।"

"দেখুন 'ওয়ালা' কাউকে দেখলেই আমার ভয় হয়। যেমন বাড়ীওয়ালা, কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা। এরা শুধু আসে পাওনা নিতে আর তাগাদা দিতে। এক মাসের পাওনা মিটে গেলেও পরের মাসের পাওনার কথা মনে করে দিয়ে যায়।"

"আগে শুনবেন তো আমার কথা। আমি আপনার বাড়ীওয়ালা হলেও তাগাদা করতে আসিনি। এসেছি নিজের কথা বলতে। পরিশ্রমের কাজ আর কিছু খুঁজে না পেয়ে পার্কে একটা বল নিয়ে পেটাপেটি করি। একলাই করি। সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। কারণ এসময় পার্কটা একটু খালি থাকে। ডেপো ছেলেগুলো সব স্কুলে যায়। কাজের লোকেরা কাজে চলে যায়।"

"বেশ তো চালিয়ে যান। এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার ডিসপেপসিয়া উড়ে গিয়ে খাই যাই শব্দ বের হতে থাকবে। তখন মনে হবে গোটা পার্কটাই খেয়ে ফেলি।"

"একলা একলা বল পেটাপেটি করতে তেমন ভাল লাগে না! খেলাটাও জমে না। খেলায় যদি আনন্দ না থাকল তাহলে কি হল! আপনি যদি আসেন তাহলে খেলাটা রোজ ভাল লাগবে। আপনারও তো এ বয়সে কিছু পরিশ্রমের কাজ দরকার। তাই নয় কি?

"দেখুন ক'দিন হলো বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। কোথাও আর বড় একটা যেতে পারি না। বাইরের কাজ টুসিই সব করে দেয়। টুসি আমাদের খুব ভাল ছেলে। যখন যা বলি তাই করতে দ্বিধা করে না। আপনার নাতি কি আমাদের টুসির মতন?"

বাড়ীয়ালা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে। "বলবেন না মশাই আমার নাতির কথা। ওটা একটা বাঁদর। খায় দায় আর পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ায় সারাদিন, একটা কথা শোনে না। শুধু কি তাই! সিনেমা দেখার পয়সা কম পড়লে পকেট হাতড়ে, বাক্স ভেঙ্গে না হয় এটা ওটা বিক্রী করে পয়সা যোগাড় করবে। সেদিন তো আমার ছাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না। খোঁজ করতে করতে জানা গেল শ্রীমান একটা পুরনো ছাতার দোকানে ওটা বিক্রী করে এসেছে।"

"এই তো বল্লেন আপনার নাতি বাড়ীর বাজার করে দেয়।"

"দূর মশাই! বাজার করতে যায় সাধে। দু' পয়সা হাতাবার জন্যেই ওর বাজার করা।"

"শুনলাম আপনার নাতির কথা। তা ওকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছেন

কেন? এ বয়সে লেখাপড়া শেখা তো বিশেষ দরকার। লেখাপড়া না শিখলে চোর গুণ্ডা বদমাসদের দলে মিশবে।"

"আমিও ভেবেছি সে কথা। ভাবিনি বলুন তো কিন্তু কি করব মশাই? স্কুলের মাইনে দিলে তা স্কুলে দেবে না। সে পয়সায় সিনেমা দেখবে। স্কুল থেকে তাই নাম কেটে তাড়িয়ে দিয়েছে সেদিন।"

বাড়ীয়ালা বলে। "যাক অনেক আবোল তাবোল বকলাম আপনার সময়ও অনেক নষ্ট হল। এবার কাজের কথা বলি।

"এ সময় একটু চা হলে ভাল হয়।"

"আপনি তো ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন বল্লেন। চা খাবেন কেন? দুধ বা হরলিকস্ কিছু খান। আমাদের বাড়ীতে চায়ের পাট নেই বুঝলেন।"

"এ যা হয় একটা কিছু দিন। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে গেছে।"

এরপর বাড়ীয়ালা বলে। "আজ বিকাল ৪টার সময় আমরা পুরোনো কজন বন্ধু মিলে একটা গার্ডেন পার্টি করছি। তাই আপনাকে বলতে এসেছি। আপনি আমাদের পুরনো বন্ধু না হলেও বয়সে কাছাকাছি। আমিই আমার বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব করেছি যে আপনিই আমাদের আজকের গার্ডেন পাটির সভাপতি হবেন। একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণও আপনি দেবেন। আপনি একজন লেখক মানুষ যদিও আপনার লেখা আজকাল কেউ পড়ে না।"

টুসি উৎসাহিত হয়ে বলে। "দাদু আমিও যাব তোমাদের ঐ গার্ডেন পাটিতে।"

দাদু বলে। "আপনাদের গার্ডেন পাটিতে খাওয়া দাওয়ার কেমন ব্যবস্থা আছে? গার্ডেন পাটিতে তো শুধু আমোদ ফুর্তি হয় তাই জানি সেখানে সভাপতিই কেন আর ভাষণ দেবারই দরকার কেন।"

"খাওয়া দাওয়া আর বিশেষ কি! হরিদাসের বুলবুল ভাজা আর চা। তা চা যত খেতে পারেন কেউ কিছু বলবে না।"

"ওসব চলবে না। সভাপতির জন্যে স্পেশাল খাদ্য দিতে হবে। তবেই আমি যাব নাহলে আপনি অন্য সভাপতি দেখুন যে শুধু এক গ্লাস জল ছাড়া কিছু খায় না।"

"বেশ তো, আপনার জন্যে হিংয়ের কচুরী আর জিলিপি আনিয়ে দেব।"

"রাখুন মশাই আপনার কচুরী জিলিপী। স্পেশাল খাদ্য বলতে মোগলাই পরোটা। দোপেঁয়াজি, অমলেট, কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, রোষ্ট, বিরানী আর ঐ সঙ্গে হাফ কিলো পুডিং। আরো কিছু ফলমূল হলে ভাল হয়।"

"আর বলতে হবে না আপনার স্পেশাল খাবারের তালিকা। খাবারের নাম শুনেই আমার ধাত ছেড়ে গেছে। আমার এক মাসের বাড়ী ভাড়াটাই খরচ হবে আপনার স্পেশাল খাবার যোগাতে।"

"রাজি থাকেন তো বলুন ভাষণ তৈরী করি। এমন ভাষণ দেব আশপাশের লোকেরাও ছুটে আসবে। এই টুসি আমি বলে যাব আর তুই আমার ভাষণটা লিখে দিবি।"

টুসি লাফিয়ে উঠে বলে। "খুব পারব দাদু।"

"তাহলে ঐ কথাই থাকল। আপনারা সব যোগাড় করুন। আর চারটের কিছু আগে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

বাড়ীয়ালা নমস্কার করে বিদায় নিল।

।। আমাদের প্রকাশিত ।।

।। ছোটদের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী এই লেখকের বিরচিত গ্রন্থসম্ভার ।।

দাদা হর্ষবর্ধন ভাই গোবর্ধন
যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন
কীর্তিমান হর্ষবর্ধন
বিগড়ে গেলেন হর্ষবর্ধন
চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন
গরু ছিল ঋষি
কথায় কথায় ফ্যাসাদ
যত খুশী হাসো
টাকা হলেই টাকা হয়
বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ
প্রাণকেষ্ট ও ধিনিকেষ্ট
ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা